হুমায়ূন আহমেদ
আনন্দ
বেদনার
কাব্য

সূচি

- আনন্দ বেদনার কাব্য ৯
- এইসব দিনরাত্রি ১৪
- উনিশ শ একাত্তর ২১
- জলছবি ২৮
- খেলা ৩৪
- শিকার ৩৯
- পাখির পালক ৪৬
- অসুখ ৫৬
- কবি ৬১

আনন্দ বেদনার কাব্য

বইটির নাম 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'।

প্রচ্ছদে একটি মেয়ের মুখের ছবি। মেয়েটি কাঁদছে। তার মুখের পাশে একটি গ্লোব। একটি বিকটদর্শন নরকঙ্কাল গ্লোবটি বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। কঙ্কালটির ডান হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। যথেষ্ট জটিলতা। পৃথিবীর রিক্তশ্রী ফুটিয়ে তোলার আয়োজনে কোনো ত্রুটি নেই।

এ ধরনের প্রচ্ছদচিত্রের বইগুলোর পাতা সাধারণত উল্টানো হয় না। তবুও অভ্যাসবশেই পাতা উল্টালাম। এবং একসময় দেখি গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকাটি পড়তে শুরু করেছি। শুরু না করলেই বোধহয় ভালো ছিল। ভূমিকাটিতে খুব মন খারাপ করা একটি ব্যাপার আছে। আমার নিজের যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট আছে, অন্যের দুঃখ-কষ্ট আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সেই সময় আমার অতি আদরের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার খানম (বেনু) উক্ত গ্রন্থের জন্যে প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কন করে। অর্থাভাবে তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আজ প্রকাশিত হইল। কিন্তু হায়, আমার বেনু মা দেখিতে পাইল না।'

বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদশিল্পীর সামান্য একটু পরিচয়ও আছে। সেখানে লেখা— প্রচ্ছদশিল্পী : মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার খানম। দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত বইটি হঠাৎ করেই অসামান্য হয়ে উঠল আমার কাছে। এই বইটি ঘিরে দরিদ্র পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিটি চোখের সামনে দেখতে পেলাম। লম্বা বেণির দশম শ্রেণীর কালোমতো রোগা একটি মেয়ে যেন গভীর ভালোবাসায় বাবার বইয়ের জন্যে রাত জেগে প্রচ্ছদ আঁকছে।

আঁকা হবার পর বাবাকে দেখাল সেটি। পৃথিবীর সব বাবাদের মতো এই বাবাও মেয়ের শিল্পকর্ম দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতে সবাই খেতে বসেছে। দরিদ্র আয়োজন। কিন্তু সবার মুখ হাসি-হাসি। বাবা বললেন, পাস করলে আমার বেনু-মাকে আমি আর্ট কলেজে দেবো। বেনু বেচারি লজ্জায় মরে যায়। ভাত মাখতে মাখতে বলল, দূর ছাই, মোটেও ভালো হয় নি। বাবা রেগে গেলেন, ভালো হয় নি মানে ? আঁকুক দেখি কেউ এরকম একটা ছবি।

বই অবশ্যি বাবা প্রকাশ করতে পারলেন না। কে ছাপবে এরকম বই ? দু'একজন প্রকাশক বলেও ফেলল, এসব পদ্যের বই কি আজকাল চলেরে ভাই ? এসব নিজের পয়সায় ছাপতে হয়। টাকা জমান, জমিয়ে নিজেই ছাপান।

প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করতে বাবার দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগল। হয়তো স্ত্রীর কানের দুলজোড়া বিক্রি করতে হলো। সেবছর ঈদে বাচ্চারা কেউ কাপড় নিল না। তিনি খুঁজে পেতে সস্তার একটি প্রেস বের করলেন, যার বেশির ভাগ টাইপই ভাঙা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ প্রেসের মালিক সালাম সাহেব, গ্রন্থকারের কবিতার একজন ভক্ত। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'টাউন প্রেসের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব আবদুস সালাম সাহেব আমার এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। এই কাব্যানুরাগী বন্ধুবৎসল মানুষটির সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। জনাব আবদুস সালাম সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নাই।'

ভূমিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে কবি সন্ধ্যাবেলায় প্রুফ দেখতে যখন যেতেন তখন সালাম সাহেব হাসিমুখে বলতেন, এই যে কবি সাহেব, আসেন, আপনার সেকেন্ড প্রুফ রেডি। কই রে কবি সাহেবের জন্যে চা আন। চা খেতে খেতে বললেন, প্রুফে চোখ বুলাতে বুলাতে আপনার একটা কবিতা পড়েই ফেললাম। বেশ লিখেছেন।

কোন কবিতাটির কথা বলছেন ?

ঐ যে কী যেন বলে, ইয়ের উপর যেটা লিখলেন। বৃষ্টি বাদলার কথা আছে যেটায়।

ও, 'নব-বর্ষা'র কথা বলছেন ?

হ্যাঁ, ঐটাই। চমৎকার। খুবই ভাবের কথা। আপনি তো ভাই বিরাট লোক।

কবি নিশ্চয়ই বই ছাপানোর সব টাকা আবদুস সালাম সাহেবকে দিতে পারেন নি। সালাম সাহেব বললেন, যখন পারেন দিবেন। কবি মানুষ আপনি। আপনার কাছে টাকা মার যাবে নাকি— হা হা হা। ক'জন পারে আপনার মতো কবিতা লিখতে ?

ভূমিকা পড়েই জানতে পারলাম নেত্রকোনা শহরের একজন প্রবীণ উকিল বাবু নলিনী রঞ্জন সাহাও জনাব আবদুস সালামের মতো কবির প্রতিভায় মুগ্ধ। কবি লিখেছেন, 'বাবু নলিনী রঞ্জন সাহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্য আগ্রহী করিয়াছে। বাবু নলিনী রঞ্জন একজন স্বভাব-কবি এবং কাব্যের একজন কঠিন সমালোচক। তিনি যখন আমার কবিতা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মঞ্জুষা'তে আমার একটি কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই কবির কাব্যগ্রন্থ অনতিবিলম্বে প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তখনই আমি স্থির করি...।'

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'তে মোট একশ' তেরোটি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতার নিচে রচনার স্থান, তারিখ এবং সময় দেয়া আছে। অনেকগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত ফুটনোট। কয়েকটি উল্লেখ করি।

'দিবাবসান' কবিতাটির ফুটনোটে লেখা, 'আমার বড় শ্যালক জনাব আমীর সাহেবের বাড়িতে এই কবিতাটি রচিত হয়। তাহার বাড়ির সন্নিকটে খরস্রোতা একটি নদী আছে (নাম স্মরণ নাই)। উক্ত নদীর তীরে এক সন্ধ্যায় বসিয়াছিলাম। দিবাবসানের পরপরই আমার মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। কবিতা রচনার উপকরণ সঙ্গে না থাকায় আবেগটি যথাযথ ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। সমস্ত কবিতাটি মনে মনে রচিত করিয়া পরে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে।'

অন্য একটি কবিতার (বাসর শয্যা) ফুটনোটটি এরকম— 'এই দীর্ঘ কবিতাটি আমি আমার বাসর রাত্রে রচনা করিয়াছি। সেই সময় বাহিরে খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। প্রচণ্ড হাওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। আমার নবপরিণীতা বালিকাবধূ মেঘগর্জনে বারবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল।'

বাসর রাত্রিতে স্বামীর এই কাব্যরোগ দেখে নতুন বৌটি নিশ্চয়ই দারুণ অবাক হয়েছিল। তার চোখে ছিল বিস্ময় এবং হয়তো কিছুটা ভয়। কবি স্বামী দীর্ঘ রচনাটি কি সেই রাত্রেই পড়ে শুনিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে? না শুনিয়ে কি পারেন? ঝড় জলের রাত। হাওয়ার মাতামাতি। টাটকা নতুন কবিতা। রহস্যমণ্ডিত এক নারী। সেই রাত কী যে অপূর্ব ছিল সেটি আমরা ফুটনোট পড়ে কিছুটা বুঝতে পারি।

এবং এও বুঝতে পারি, যে লোক বিয়ের রাতে সাড়ে ছ'পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখতে পারেন, তিনি পরবর্তী সময়ে কী পরিমাণ বিরক্তি ও হতাশার সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীর মনে। ঘরে হয়তো টাকা-পয়সা নেই। ছোট ছেলের জ্বর। তার জন্যে সাগু কিনে আনতে হবে। কিন্তু ছেলের বাবা কবিতার খাতা নিয়ে

বসেছেন। গভীর ভাবাবেগে তাঁর চোখে জল। লিখছেন 'একদা জ্যোৎস্নায়' নামের দীর্ঘ কোনো রচনা। কেন কিছু কিছু মানুষ এমন নিশি-পাওয়া হয়? দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বঞ্চনা কিছুই তাঁদের স্পর্শ করে না। স্বর্গীয় কোনো একটি হিংস্র পশু তাঁদের তাড়া করে ফিরে। কেন করে? আমার উত্তর জানা নেই। জানতে ইচ্ছে হয়।

এইসব নিশি-পাওয়া মানুষদের বেশিরভাগই নিজের ক্ষুদ্র পরিবার এবং কয়েকজন ভালোমানুষ বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কারো কাছে তাঁদের আবেগের কথা পৌঁছাতে পারেন না। কৃপণ ঈশ্বর এদেরকে আবেগে উদ্বেলিত হবার মতো অপূর্ব একটি হৃদয় দিয়ে পাঠান, কিন্তু সেই আবেগকে প্রবাহিত করবার মতো ক্ষমতা দেন না। এরা বড় দুঃখী মানুষ।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমার এমন কষ্ট হলো। কবি কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কত আজেবাজে জিনিসই না লিখেছেন। ইরানের শাহকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা আছে। কী আছে এই স্বৈরাচারী রাজার মধ্যে যে তাকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা লিখতে হলো? তিনটি কবিতা আছে মহাসাগর নিয়ে। কবি কিন্তু সাগর-মহাসাগর কিছুই দেখেন নি। [সমুদ্র দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে বহুবার আমি মনশ্চক্ষে সমুদ্র দেখিয়াছি। ফুটনোট, 'হে মহাসিন্ধু'।]

কবিতা আমি পড়ি না। কিন্তু 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র প্রতিটি কবিতা আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। কিছুই নেই। কষ্টে সঞ্চিত শেষ মুদ্রাটিও নিশ্চয়ই চলে গেছে এই বইয়ে। বাকি জীবন এই পরিবারটি অবিক্রিত গ্রন্থটির প্রতিটি কপি গভীর আগ্রহে আগলে রাখবে। প্রাণে ধরে সের দরে বিক্রি করতে পারবে না। বইয়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে স্ত্রী মাঝে মাঝে গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তাতে কী আছে? অন্তত একটি দিনের জন্যে হলেও তো এই পরিবারটিতে আনন্দ এসেছিল। কবি-স্ত্রী মুগ্ধচোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলেন, আমার স্বামী তাহলে সত্যি সত্যি একটি বই লিখে ফেলেছেন? ছেলেমেয়েরা বাবার বই নিয়ে ছুটে গেছে বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে।

বাবা প্রথমবারের মতো বুক উঁচু করে তাঁর বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে বলেছেন, স্যার, আপনার জন্যে একটা বই আনলাম। বড় সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আরে আপনি আবার বই লিখলেন কবে?

স্যার, প্রচ্ছদটা আমার মেয়ের আঁকা।

তাই নাকি? বাহ্ চমৎকার!

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র শেষ কবিতাটি সম্পর্কে বলি। শেষ কবিতাটির নাম— 'মাগো'। কবিতাটি নুরুন্নাহার খানমকে নিয়ে লেখা। ফুটনোট থেকে জানতে পারি, মৃত্যুর আগের রাতে সে যখন রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার অসহায় বাবা এই কবিতাটি লিখে এনেছিলেন মেয়েকে কিঞ্চিৎ 'উপশম' দেবার জন্যে। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং রচনাভঙ্গি অন্য কবিতার মতোই কাঁচা। কিন্তু প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন জলে লেখা বলেই বোধকরি কবিতাটি দুঃখী বাবার মতোই হাহাকার করে ওঠে। সেই হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যায় অদেখা সব ভুবনের দিকে।

একটিমাত্র কবিতা লিখেও কেউ কেউ কবি হতে পারেন। অল্পকিছু পঙ্‌ক্তিমালাতেও ধরা দিতে পারে কোনো এক মহান বোধ, মহান আনন্দ, জগতের গভীরতম ক্রন্দন। সেই অর্থে আমাদের 'রিক্তশ্রী'র কবি একজন কবি।

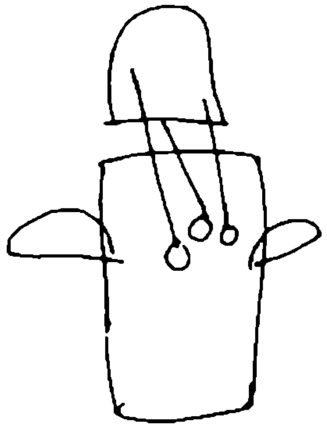

এইসব দিনরাত্রি

থার্ড পিরিয়ডে প্রণব বাবুর কোনো ক্লাস নেই।

তিনি কমনরুমে এসে পত্রিকা খুঁজতে লাগলেন। একটি মাত্র পত্রিকা রাখা হয়। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটি হেডমাস্টার সাহেবের ঘরে থাকে। আজ হেডমাস্টার সাহেব আসেন নি। তার মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। ছেলের বড় ফুপা এসেছেন। সেই উপলক্ষে তিনি বড় সাইজের কৈ মাছের খোঁজে গিয়েছেন।

কাজেই কমনরুমের টেবিলে পত্রিকাটি পাওয়া গেল। ভাঁজ পর্যন্ত খোলা হয় নি। এরকম একটা কড়কড়ে নতুন পত্রিকা পড়ার আনন্দই অন্যরকম। প্রণব বাবু কোণার দিকে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরই তার কপাল দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল। তিনি ভাঙা গলায় ডাকলেন, বশীর মিয়া! ও বশীর মিয়া!

বশীর মিয়া স্কুলের দপ্তরি। সেও হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে কৈ মাছের খোঁজে গিয়েছে। কেউ এলো না। ফোর্থ পিরিয়ডে আজিজুদ্দীন সাহেব কমনরুমে পানি খেতে এসে দেখেন প্রণব বাবু মরার মতো পড়ে আছেন।

প্রণব বাবু, কী হয়েছে?

প্রণব বাবু বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তাঁর কথা জড়িয়ে গেল। আজিজুদ্দীন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, শরীর খারাপ না-কি? এ্যাই প্রণব বাবু!

শরীর ঠিক আছে।

আজিজুদ্দীন সাহেব কপালে হাত রাখলেন। না কপাল ঠাণ্ডা। জ্বরজ্বারি কিছু নেই।

প্রণব বাবু দুর্বল কণ্ঠে বললেন, পানি খাব। একটু পানি দেন।

মাথা ঘুরছে নাকি ? এ্যাই প্রণব বাবু ?

প্রণব বাবু ফিসফিস করে বললেন, লটারির রেজাল্ট দিয়েছে।

আজিজুদ্দীন সাহেবের ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় লাগল। রেডক্রস লটারির দু'টাকা দামের টিকিট সবাইকে একটি করে কিনতে হয়েছে। হেডমাস্টার সাহেব পঞ্চাশটা টিকিট ময়মনসিংহ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। গম্ভীর গলায় বলেছেন, সবাইকে কিনতে হবে। দেশের কাজ। আমরা শিক্ষকরা যদি না করি কারা করবে ? সবার জন্যে একটা এগজাম্পল সেট করতে হবে। পাঁচটা করে কিনবেন সবাই।

থার্ড মাস্টার জলিল সাহেব মুখ কালো করে বললেন, দু'মাস ধরে বেতন নাই, এর মধ্যে এইসব আবার কী ঝামেলা স্যার ?

দেশের কাজের মধ্যে আবার ঝামেলার কী দেখলেন ? পাঁচটা করে কিনবেন সবাই। আর স্টুডেন্টদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটের ব্যবস্থা করবেন। দেশের কাজ।

পাঁচটা করে টিকিট কিনতে হলো সবাইকে। হেডমাস্টার সাহেব দেশের কাজের জন্য হঠাৎ করে এত ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার রহস্যও উদ্ধার হলো। প্রতি দশটি টিকিটে তার দু'টাকা করে লাভ থাকে।

সেই লটারির রেজাল্ট দেখে প্রণব বাবুর কপাল ঘামছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে— তার অর্থ কী ? আজিজুদ্দীন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার ভাই, কিছু পেয়ে গেলেন নাকি ? অ্যাঁ ?

প্রণব বাবু জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, পেয়েছি।

আজিজুদ্দীন সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ক্লাস নাইনে তার ইংরেজি গদ্য পড়াবার কথা, তিনি আর সেখানে গেলেন না। প্রণব বাবুর পাশের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলেন। দুনিয়াতে কত অসম্ভব ব্যাপারই না ঘটে। প্রণব বাবু পরশু দিন তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, হাত একেবারে খালি। কোথেকে টাকা আসবে ? গত মাসেও হাফ বেতন হয়েছে। আজিজুদ্দীন সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, এরকম ভ্যাবদার মতো বসে আছেন কেন ? ফুর্তি-টুর্তি করেন।

কী ফুর্তি করব ?

তাও ঠিক। লোকজন এরকম হঠাৎ লক্ষপতি হলে কী করে ফুর্তি করে কে জানে।

রেজাল্টটা কোথায় দিয়েছে ? দেখি পত্রিকাটা।

ক্লাস নাইনের ছেলেগুলো বড্ড গণ্ডগোল করছে। একজন এসে কমনরুমে উঁকি দিয়ে দেখে গেল। আজিজুদ্দীন সাহেব ভ্রূ কুঁচকে লটারির খবর দু'তিনবার পড়লেন। তার কাছে কোনো টিকিট নেই। তিনি সবগুলো নেজামের চায়ের স্টলে বিক্রি করে ফেলেছেন।

টিফিন পিরিয়ডে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। মাস্টারদের কারো আর ক্লাস নেয়ার উৎসাহ রইল না। সবাই কমনরুমে শুকনো মুখে বসে রইলেন। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় ছেলেদের জন্য আনা টিফিন বেঁচে গেছে। লুচি আর বুন্দিয়া। অন্যসময় হলে টিফিনের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে উৎসাহী আলোচনা চলত, আজ আর কিছুই জমছে না। ক্লাস টেনের ছেলেগুলো কমনরুমের দরজার কাছে জটলা পাকাচ্ছিল। আজিজুদ্দীন সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিলেন, নাট্যশালা নাকি অ্যাঁ ? যা বাড়ি যা। দু'দিন পরে পরীক্ষা কোনো হুঁশ নাই। গোরুর দল!

হেডমাস্টার সাহেব খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। এবং খুব হৈ-চৈ শুরু করলেন।

স্কুল ছুটি দিয়েছে কে ? স্কুল ছুটি দেয়ার মতো কী হয়েছে বলেন তো ? একজন লটারিতে ক'টা টাকা পেয়েছে, আর ওম্নি স্কুল ছুটি ? পেয়েছেনটা কী ?

হেডমাস্টার সাহেবের কথায় কারো কোনো ভাবান্তর হলো না। অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, কী ভ্যানরভ্যানর করছেন ? কে গিয়ে এখন ক্লাস নেবে ?

অসুবিধাটা কী ? আমি তো এর মধ্যে অসুবিধার কিছু দেখলাম না।

তিন মাস বেতন নাই। এর মধ্যে একজন দু'লাখ টাকা পেলে মেজাজ ঠিক থাকে ?

তিন মাস বেতন নাই কথাটা তো ঠিক বললেন না। হাফ বেতন হয়েছে গত মাসে। এসএসসি পরীক্ষার কালেকশন হলে বাকিটা পাবেন। ভালো কালেকশন হবে এইবার।

রশীদ মিয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফিরে এসেছে। সে একটি বড় গামলায় তেল-মরিচ দিয়ে মুড়ি মাখছিল। দুপুরে এটাই স্যারদের টিফিন। কেরোসিন কুকারে চায়ের পানি ফুটছে। হেডমাস্টার সাহেব বিরসমুখে বললেন, আজকেও মুড়ি ? আজ একটা ভালো টিফিনের দরকার ছিল।

কেউ কোনো সাড়া দিল না। টিফিন পর্ব শেষ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। টিচাররা সবাই বাড়ি চলে গেলেন। প্রণব বাবু নড়লেন না। হেডমাস্টার সাহেব একসময় বললেন, বাড়ি গিয়ে আমোদ ফূর্তি করেন। চুপচাপ বসে আছেন কী ভাবে ?

ভালো লাগছে না স্যার।

ভালো লাগবে না কেন ? আজকে তো আপনার ভালো লাগারই দিন। হেডমাস্টার সাহেব শুকনো গলায় টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন।

জোর-জবরদস্তি করে কিনিয়েছে বলেই পেলেন। মনে রাখবেন সেটা। হা-হা-হা। উপকারের কথা কারো মনে থাকে না, এইটাই দুনিয়ার নিয়ম।

প্রণব বাবু বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। পরিষ্কার বুঝা গেল না। হেডমাস্টার সাহেব শুকনো গলায় বললেন, যে টিকিটে পেয়েছেন সেটা আছে তো ? অনেক সময় দেখা যায় টিকিটটাই মিসিং। তখন সবই গেল।

প্রণব বাবু মানিব্যাগ থেকে টিকিট বের করে হেডমাস্টার সাহেবের হাতে দিলেন। হেডমাস্টার সাহেব ভ্রু কুঞ্চিত করে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন টিকিটের দিকে।

তার মেয়ের এই বিয়ের প্রস্তাবটাও হয়তো ভেঙে যাবে। ছেলের ফুপা বলেছে ছেলের নাকি মটর সাইকেলের খুব সখ। অজপাড়াগাঁর পোস্ট মাস্টারের ছেলে মোটর সাইকেল দিয়ে করবেটা কী ? তেরো টাকার কৈ মাছ জলে গেছে বলাই বাহুল্য। হেডমাস্টার সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, প্রণব বাবু, আপনি এইবার একটা মোটর সাইকেল কিনে ফেলেন।

মটর সাইকেল দিয়ে আমি কী করব ?

চড়বেন চড়বেন। আপনাদের তো দিনকাল।

হেডমাস্টার সাহেব আবার টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন।

প্রণব বাবু স্কুল থেকে বেরুলেন সন্ধ্যার পর। তাঁর ধারণা ছিল বাজারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অসংখ্যবার লটারির টাকা পাওয়ার খবর তাকে বলতে হবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। কেউ কি জানে না খবরটা ? আশ্চর্য!

তাঁর ছেলে সুবল যেবার ময়মনসিংহে চুরি কেইসে গ্রেফতার হলো সেবার প্রণব বাবুকে অসংখ্যবার ব্যাপারটা বলতে হয়েছে।

ফল্‌স কেইস বোধহয়। কী বলেন প্রণব বাবু ? হাজার হলেও আপনার ছেলে। ভদ্রলোকের সন্তান।

ফল্‌স কেইস না। চুরি সত্যি-সত্যি করেছে।

বলেন কী! ব্যাপারটা ঠিকমতো বলেন তো শুনি। বসেন না। এ্যাই বাবুকে চা দে।

আজ প্রণব বাবু নীলগঞ্জ বাজারের প্রায় শেষপ্রান্তে চলে আসলেন। কেউ কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না। বাজার থেকে বেরুবার সময় করিম মিয়া চিকন গলায় ডাকল, বাবু, একটু শুনে যান তো।

কী ব্যাপার ?

মোট দু'শ এগারো টাকা পাওনা। আমরা গরীব ব্যবসায়ী। এতটা টাকা আটকা পড়লে চলে ?

দিয়ে দিব।

দিয়ে দিব সেইটা তো বাবু দু' তিন মাস ধরেই শুনতেছি। নিবারন সাহার কাছে এইরকম চারশ টাকা পাওনা। হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে চলে গেল ইন্ডিয়া।

আমি ইন্ডিয়া যাব না। ইন্ডিয়াতে আমার কেউ নাই।

প্রণব বাবুর খুব ইচ্ছা হলো লটারির কথাটা বলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না।

প্রণব বাবু বাড়ি পৌছলেন রাত আটটার দিকে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাড়াশব্দ করার লোকও অবশ্যি নেই। চারদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। তিনি হাতড়ে-হাতড়ে তালা খুললেন। হারিকেন জ্বালালেন। টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা আছে। খান কতক রুটি, একটা ভাজি, এক বাটি তেঁতুলের টক। তার রান্না হয় জ্যাঠার বাড়িতে। রান্না হয়ে গেলে তালা খুলে খাবার রেখে যায়। সেই বাবদ জ্যাঠার হাতে যখন যা পারেন দেন।

প্রণব বাবু কেরোসিন কুকার জ্বালিয়ে রুটি গরম করতে বসলেন, তখনই হঠাৎ করে সুবল এসে উপস্থিত। সুবলের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয় না বললেই হয়। গত ছ'মাসে একবার মাত্র এসেছিল দু'দিনের জন্যে। তিনি কোনো কথাবার্তা বলেন নি। আজকে নিজে থেকেই কথা বললেন, আছিস কেমন সুবল ?

আছি কোনো মতো। তুমি আছ কেমন বাবা ?

খেয়ে এসেছিস নাকি ?

হুঁ। মটন বিরিয়ানি খেয়েছি ইস্টিশনে। জানি তো এত রাত্রে খাওয়াদাওয়ার কোনো আয়োজন তোমার নাই। খাচ্ছ কী তুমি ? রুটি নাকি ?

হুঁ। খাবি একটা ?

না।

প্রণব বাবু খেতে বসলেন। সুবল বাইরেরর বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরাল। প্রণব বাবু লক্ষ করলেন সুবলের গায়ে চকচকে একটা সার্ট থাকলেও তার পায়ের চামড়ার জুতোজোড়াতে তালি পড়েছে। যে মটরশপে মেকানিকের কাজ শিখত সেখানে পয়সাকড়ি বোধহয় কিছুই দেয় না।

তাঁর মনে পড়ল দু'মাস আগে আড়াইশ টাকা চেয়ে ভুল বানানে তিন পাতার একটা চিঠি লিখেছিল সুবল। তিনি জবাব দেন নি। এবারো টাকার জন্যেই বোধহয় এসেছে।

বাবা, ঘরে চায়ের পাতা আছে ?

আছে বোধহয়। দেখ তো হরলিক্সের বোতলটার মধ্যে।

সবুল চায়ের পানি চাপিয়ে মৃদুস্বরে বলল, তোমার কাছে তিনশ' টাকা হবে বাবা ? আমার খুবই দরকার।

প্রণব বাবু অনেকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাবা, খুব ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি।

প্রণব বাবু কিছু বললেন না।

একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে বাবা।

প্রণব বাবুর ইচ্ছা হলো জিজ্ঞেস করে— কী ঝামেলা ? কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর যে মেয়ে কলকাতার শিবপুরে ছিল সেও কী একটা ঝামেলায় পড়েছিল। এক হাজার টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু সেই ছোট্ট চিঠি পড়ে তিনি সারারাত ঘুমাতে পারেন নি। মেয়েটি অনেক বয়স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ঘুমাত। কী বিশ্রী ঘুম। পা দুটি বুকের কাছে এনে মাথা বাঁকা করে। কত বকাঝকা কত কী। লাভ হয় নি কিছুই। অঞ্জুর সেই চিঠির জবাব তিনি দেন নি। লজ্জাতেই দিতে পারেন নি। দীর্ঘ একবছর সেই চিঠি পকেটে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ক্লাসে গিয়েছেন। পাটিগণিতের কঠিন কঠিন সব অংক জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রণব বাবু বারান্দায় গিয়ে বসলেন। কী চমৎকার জ্যোৎস্না!

অন্ধকার হালকা হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। লেবুফুলের ঘ্রাণ আসছে। গাছটাতে লেবু হয় না, শুধুই ফুল ফুটে। গাছগাছালির কোনো যত্ন নেই আর। কে যত্ন করবে ? সুবল চায়ের কাপ নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাবা, খুব বড় একটা ঝামেলার মধ্যে পড়েছি।

সবাই বড় ঝামেলায় পড়ে। তিনিও মেয়েকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলেন। ছেলে পাওয়া যায় না। শেষটায় কেদারনাথ বাবু কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিলেন। বিয়েটা কেমন হয়েছিল কে জানে ? বর পছন্দ হয়েছিল পাগলিটার ? আজ আর তা জানবার কোনো উপায় নেই। বাবাকে কি আর এইসব কথা কোনো মেয়ে লেখে ? বাবাকে লিখতে হয় দারুণ সমস্যার সময়।

সুবল মৃদুস্বরে বলল, বাবা চা খাবে, চা দেই ?

দে।

চিনি নাই। চিনি ছাড়া চা।

দে একটু।

সুবল তাকিয়ে দেখল তার বাবার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ব্যাপারটা কী? সে আড়চোখে তাকাতে লাগল।

তিনশ টাকা না পেলে বেইজ্জত হব।

সুবল কথাটা বলেই মাথা নিচু করে ফেলল। এবং লক্ষ করল তার নিজের চোখও ভিজে উঠছে। সে হঠাৎ বলে ফেলল, বড় কষ্ট বাবা।

কষ্ট! হ্যাঁ কষ্ট তো বটেই। প্রণব বাবু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

টাকাটার কি জোগাড় হবে?

প্রণব বাবু জবাব দিলেন না। চোখ মুছলেন। সুবল বাবার কাছে সরে এলো। প্রণব বাবু হঠাৎ কী মনে করে সুবলের একটি হাত চেপে ধরে সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠলেন। সুবল বলল, কাঁদবে না বাবা। দেখি একটা ব্যবস্থা করব আমি নিজেই। কাঁদবে না।

মেয়েটারে বড় দেখতে ইচ্ছা হয় সুবল।

তিনি দু লক্ষ টাকার একটি টিকিট পকেটে নিয়ে একজন নিঃস্ব মানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। সুবল বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। তিনশ টাকার তার সত্যি খুব প্রয়োজন ছিল। সুবলের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু সে কাঁদল না। উদাস গলায় বলল, চিন্তার কিছু নাই বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রণব বাবু ধরা গলায় বললেন, কিছুই ঠিক হয় না রে। তার কথা সমর্থন করেই ঘরের ভিতর থেকে একটি তক্ষক ডেকে উঠল। চারদিকে মাছের চোখের মতো মরা জ্যোৎস্না।

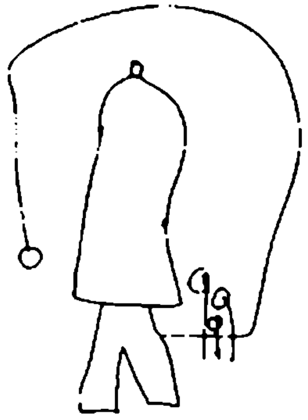

উনিশ শ একাত্তর

তারা এসে পড়ল সন্ধ্যার আগে আগে।

বিরাট একটা দল। মার্চ টার্চ কিছু না। এলোমেলোভাবে হেঁটে আসা। সম্ভবত বহুদূর থেকে আসছে। ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছে একেক জন। ঘামে মুখ ভেজা। ধূলিধুসরিত খাকি পোশাক।

গ্রামের লোকজন প্রায় সবাই লুকিয়ে পড়ল। শুধু বদি পাগলা হাসিমুখে এগিয়ে গেল। মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, বিষয় কী গো ?

পুরো দল থমকে দাঁড়াল মুহূর্তে। বদি পাগলার হাতে একটা লাল গামছা। সে গামছা নিশানের মতো উড়িয়ে চেঁচাল, কই যান গো আপনেরা ? এমন অদ্ভুত ব্যাপার সে আগে কখনো দেখে নি।

মেজর সাহেবের চোখে সানগ্লাস। তিনি সানগ্লাস খুলে ফেলে ইংরেজিতে বললেন, লোকটা কী বলছে ? রফিক উদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বলল, লোকটা মনে হচ্ছে পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে পাগল থাকে।

তাই নাকি ?

জি স্যার।

বুঝলে কী করে এ পাগল ?

রফিক উদ্দীন চুপ করে গেল। মেজর সাহেবের খুব পেঁচানো স্বভাব, একটি কথার দশটি অর্থ করেন। বদি পাগলাকে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। তার মুখভর্তি হাসি। রফিক ধমকে উঠল, এ্যাই কী চাস তুই ? বদি পাগলার হাসি আরো বিস্তৃত হলো। রফিক কপালের ঘাম মুছল। সরু গলায় বলল, লোকটা স্যার পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে ...।

এই কথা তুমি আগে একবার বলেছ। একই কথা দু' তিনবার বলার প্রয়োজন নেই।

রফিক ঢোঁক গিলল। মেজর সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এ জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। সবাই টায়ার্ড।

মাইল পাঁচেক গেলেই স্যার নবীনগর। খুব বড় বাজার। পুলিশ ফাঁড়ি আছে। সন্ধ্যা নামার আগে আগে নবীনগর চলে যাওয়া ভালো।

কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

জি-না স্যার, ভয় পাব কেন?

মেজর সাহেব দলটির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বললেন। মৃদু একটা সাড়া জাগল। নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটেয়ে বসে পড়ল সবাই। মাথা থেকে ভারী হ্যালমেট খুলে ফেলতে লাগল। মেজর সাহেব নিচু স্বরে বললেন, পাগলটাকে বেঁধে ফেলতে বলো। তিনি কাঠের একটি বাক্সের উপর বসে পাইপ ধরালেন। খাকি পোশাক পরা কারো মুখে পাইপ মানায় না। কিন্তু এই মেজর অসম্ভব সুপুরুষ। তাঁর মুখে সবকিছুই মানায়।

পাগলটাকে আমগাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো। তার কোনো আপত্তি দেখা গেল না। বরং কাছাকাছি থাকতে পারার সৌভাগ্যে তাকে আনন্দিতই মনে হলো। কেউ তার দিকে তেমন নজর দিল না। এরা অসম্ভব ক্লান্ত। এদের দৃষ্টি নিরাশক্ত ও ভাবলেশহীন।

মেজর সাহেব পানির বোতল থেকে কয়েক চুমুক পানি খেলেন। বুটজুতা জোড়া খুলে ফেললেন। তাঁর বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়েছে। রফিক বলল, ডাব খাবেন স্যার? মেজর সাহেব সে-কথার জবাব না দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, আগে আমরা কোনো গ্রামে গেলেই ছোটখাটো একটা দল পাকিস্তানি পতাকা হতে নিয়ে আসত, এখন আর আসে না। এর কারণ কী, জানো?

জানি না স্যার।

ভয়ে আসে না। এই গ্রামের সব কটি লোক এখন জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। ঠিক না?

রফিক জবাব দিল না। বদি পাগলা বলল, এট্টু বোতলের পানি খাইতে মন চায়।

ও কী চায়?

ওয়াটার বটল থেকে পানি খেতে চায় স্যার।

গ্রামের সবাই পালিয়ে গেলেও আজীজ মাস্টার যেতে পারে নি। কারণ ঘোনাপাতা থেকে তার ছোট বোন এসেছিল। আজ সকাল থেকেই তার প্রসব ব্যথা শুরু হয়েছে। এরকম একজন মানুষকে নিয়ে টানাটানি করা যায় না। তবু দু'বার বলল, ধরাধরি কইরা নাওডাত নিয়া তুললে শ্যামগঞ্জ লইয়া যাওন যায়। তার জবাবে আজীজ মাস্টারের মা তার কাপুরুষতা নিয়ে কুৎসিত একটা গাল দিয়েছেন। ঠ্যাং ভাঙা বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আজীজ মাস্টার প্রতিবাদ করে নি, কারণ কথাটি সত্যি। সে বড়ই ভীতু। গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে শোনার পর থেকে তার ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। সে বসে আছে উঠানে। এবং সামান্য শব্দেও দারুণভাবে চমকে উঠছে।

মাস্টার, বাড়িত আছ ?

কেডা ?

আমরা। খবর হুনছ ? বদি পাগলারে বাইন্ধা রাখছে আম গাছে।

হুনছি।

নীলগঞ্জের মুরুব্বিদের কয়েকজন শংকিত ভঙ্গিতে উঠে এলো উঠোনে।

তোমার তো এট্টু যাওন লাগে মাস্টার।

কই যাওন লাগে ?

দবীর মিয়া তার উত্তর না দিয়ে নিচু গলায় বলল, তুমি ছাড়া কে যাইব ! তুমি ইংরেজি জানো। শুদ্ধ ভাষা জানো।

মিলিটারির কাছে যাইতে কন ?

হ।

আমি গিয়া কী করতাম ?

গিয়া কইবা এই গ্রামে কোনো অসুবিধা নাই। পাকিস্তানের নিশানটা হাতে লইয়া যাইবা। ভয়ের কিছু নাই।

মাস্টার অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। দবীর মিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, কথা কও না যে ?

আমি যাই ক্যামনে ? বাড়িত অত বড় বিপদ। পুভির বাচ্চা অইব।

তোমার তো কিছু করনের নাই মাস্টার। তুমি ডাক্তারও না কবিরাজ না।

মাস্টার ক্ষীণস্বরে বলল, পাকিস্তানের পতাকা পাইয়াম কই ?

ক্যান ইস্কুলের পতাকা কী করলা ?

ফালাইয়া দিছি।

ফালাইয়া দিছ ? ক্যান ?

মাস্টার জবাব দেয় না। দবীর মিয়া রাগী গলায় বলে, আইএ পাশ করলে কী হইব মাস্টার, তোমার জ্ঞান বুদ্ধি অয় নাই। পতাকাটা তুমি ফালাইলা কোন আক্কেলে ? অখন কী আর করবা, যাও খালি হাতে।

আমার ডর লাগে চাচাজি।

ডরের কিছু নাই। এরা বাঘও না ভাল্লুকও না। তুমি গিয়া খাতির যত্ন কইরা দুইটা কথা কইবা। এক মিনিটের মামলা। কী কও আসমত ?

নেয্য কথা।

দেরি কইরো না। আন্ধাইর হওনের আগেই যাও।

একলা ?

একলা যাওনই বালা। একলাই যাও। তিনবার কুলহু আল্লাহ্ কইয়া ডাইন পাওডা আগে ফেলবা। পাঁচবার মনে মনে কইবা, ইয়া মুকাদ্দেমু। ভয় ডরের কিছুই নাই মাস্টার। আল্লাহ্র পাক কালাম। এর মরতবাই অন্যরকম।

আজীজ মাস্টার মাথা নিচু করে বসে রইল। তার আবার প্রস্রাবের বেগ হয়েছে। ঘরের ভেতর থেকে পুতি কুঁ কুঁ করছে। প্রথম পোয়াতী, খুব ভোগাবে।

ভইনটারে এমুন অবস্থায় ফালাইয়া ক্যামনে যাই।

এইটা কী কথা ? তুমি ঘরে থাইক্যা করবাটা কী ? বেকুবের মতো কথা কও খালি। উঠ দেহি।

আজীজ মাস্টার উঠল।

মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় তার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। তাঁর মুখের ভাব ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। তিনি বসে আছেন কাঠের একটি বড় বাক্সের উপর। পা দু'টি ছড়ানো। মেজর সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কী চাও ?

আজীজ মাস্টার থতমতো খেয়ে গেল। এ বাংলা জানে নাকি ? কী আশ্চর্য!

কী চাও তুমি ?

জি কিছু চাই না।

মেজর সাহেব এবার ইংরেজিতে বললেন, কিছু না চাইলে এসেছ কেন ? তামাশা দেখতে ? সার্কাস হচ্ছে ?

আজীজ মাস্টার ঘামতে শুরু করল। মেজর সাহেবের পরবর্তী সমস্ত কথোপকথন হলো ইংরেজিতে। আজীজ মাস্টার বেশিরভাগ জবাবই দিল বাংলায়। তাতে অসুবিধা হলো না। মেজর সাহেব ভালো বাংলা জানেন।

তুমি কী কর ?

আমি এখানকার প্রাইমারি স্কুলের টিচার।

এখানে আবার স্কুলও আছে নাকি ?

জি স্যার।

আর কী আছে ?

একটা মসজিদ আছে।

শুধু মসজিদ। মন্দির নাই ? পূজা হয় যেখানে।

জি-না স্যার।

ঠিক করে বলো মন্দির আছে কি না।

নাই স্যার।

মেজর সাহেব পাইপ ধরালেন। ঠান্ডা গলায় কাকে যেন পাঞ্জাবি বা অন্য কোনো ভাষায় কী বললেন। সেই লোকটি উঠে এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল আজীজ মাস্টারের গালে। আজীজ মাস্টার চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আমগাছের সঙ্গে বাঁধা বদি পাগলা দারুণ অবাক হয়ে বলল, ও মাস্টর, উঠ উঠ।

যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে মেজর সাহেব বললেন, তোমার নাম কী ?

আজীজুর রহমান।

আজীজুর রহমান, তোমাদের এদিকে মুক্তিবাহিনী আছে ?

জি-না।

সবাই পাকিস্তানি ?

জি।

বাহ্ খুব ভালো। তুমি নিজেও একজন খাঁটি পাকিস্তানি, ঠিক না ?

জি স্যার।

সবাই পাকিস্তানি হলে এত ভয় কিসের ? আমার তো মনে হয় এ গ্রামের সবাই ভয়ে পালিয়েছে। মেয়েগুলি লুকিয়ে আছে জঙ্গলে। ঠিক না ?

আজীজ মাস্টার জবাব দিল না। তার মাথা ঘুরছে। বমি আসছে। বহু কষ্টে সে বমির বেগ সামলাতে লাগল।

তোমাদের কি ধারণা আমরা তোমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাব ?

আজীজ মাস্টার চুপ করে রইল।

কী, কথা বলছ না যে ? তোমার নিজের স্ত্রীও কি জঙ্গলে লুকিয়েছে ?

স্যার, আমি বিয়ে করি নি।

বিয়ে কর নি ? বয়স কত তোমার ?

চল্লিশ।

চল্লিশ ! এখনো বিয়ে কর নি ? তাহলে চালাও কীভাবে ? মাস্টারবেট কর ?

আজীজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। মেজর সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন, কথার জবাব দাও।

রফিক উদ্দীন ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার জানতে চাচ্ছেন আপনি হস্তমৈথুন করেন কিনা। বলে ফেলাই ভাই। স্যার রেগে যাচ্ছেন।

করি না।

বলো কী ? তোমার যন্ত্রপাতি ঠিক আছে ? দেখি পায়জামা খুলে সবাইকে দেখাও তো।

স্যার কী বললেন ?

পায়জামা খুলে তোমার যন্ত্রটা সবাইকে দেখাতে বললাম। ঝটপট কর। দেরি করবে না। আমার হাতে সময় বেশি নেই।

আজীজ মাস্টার অবাক হয়ে তাকাল রফিকের দিকে। রফিক উদ্দীন অস্পষ্ট সুরে বলল, খুলে ফেলেন ভাই। ব্যাটা ছেলেদের মধ্যে আবার লজ্জা কী ? খুলে ফেলেন, স্যার রাগ করছেন।

মেজর সাহেব নিচু গলায় কী একটা বললেন। একজন এসে হ্যাঁচকা টানে আজীজ মাস্টারের পায়জামা নামিয়ে ফেলল। মেজর সাহেব বললেন, জামাটাও খুলে নাও।

আজীজ মাস্টার দু'হাতে তার লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করতে লাগল। একটা মৃদু হাসির গুঞ্জন উঠল চারদিকে। একজন কে যেন কাগজের দলা পাকিয়ে ছুড়ে মারল আজীজ মাস্টারের দিকে। মেজর সাহেব বললেন, তুমি পাকিস্তানিদের ভালোবাস ?

বাসি।

গুড। পাকিস্তানি মিলিটারিদের ভালোবাস ?

জ্বি স্যার।

ভেরি গুড। আমাকেও নিশ্চয়ই ভালোবাস। বাস না ? বলো, বলে ফেলো।

বাসি স্যার।

যে তোমাকে নেংটো করে দাঁড়া করিয়ে রেখেছে তাকেও তুমি ভালোবাসছ। তুমি তো বিশ্বপ্রেমিক দেখছি।

মেজর সাহেব অনুচ্চ স্বরে কী একটা বলতেই চারদিকে হাসির বান ডেকে গেল। বদি পাগলা চোখ বড় বড় করে বলল, মাস্টর তোমার কাপড় কই ? এ্যাই মাস্টর। আজীজ মাস্টার ঘোলা চোখে তাকাল তার দিকে। তার বমি বমি ভাবটা কেটে গেছে, শুধু মাথার পেছন দিকটায় তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটি যন্ত্রণা। মেজর সাহেব বললেন, আজীজুর রহমান, তুমি ভয়ে মিথ্যা কথা বলছ। প্রাণে বাঁচবার জন্যে। সত্যি কথা বলো, তোমাকে ছেড়ে দেব। তুমি কি আমাছে পছন্দ কর ?

না।

পাকিস্তানিদের পছন্দ কর ?

না।

এই তো আসল কথা বেরুচ্ছে। তুমি কি চাও এটা বাংলাদেশ হোক ?

তুমি তাহলে একজন দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। আমি সেই ব্যবস্থাই করতে চাই। নাকি তুমি বাঁচতে চাও ?

আজীজ মাস্টার জবাব দিল না।

দেরি করবে না। বলে ফেলো বাঁচতে চাও কিনা।

রফিক উদ্দীন ভয় পাওয়া গলায় বলল, বলেন ভাই, বাঁচতে চাই। এরকম করছেন কেন ? শুধু শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।

বদি পাগলা আবার কথা বলে উঠল, ও মাস্টর কাপড় পিন্দ। তুমি নেংটা।

আজীজ মাস্টার নড়ল না। মেজর সাহেব বললেন, কাপড় পর। কাপড় পরে আমার সামনে থেকে বিদেয় হয়ে যায়। ক্লিয়ার আউট।

আজীজ মাস্টার কাপড় পড়ল না। হঠাৎ একদলা থু থু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের ডান পায়ের হাঁটুর কাছে এসে পড়ল। মেজর সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। চারদিকে কোনো শব্দ নেই। আজীজ মাস্টার এগিয়ে এসে আরেক দলা থুথু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের সার্টে এসে পড়ল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, এবার আমরা রওনা হব।

সৈন্যদল মার্চ করে এগুচ্ছে। মেজর সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মানুষ।

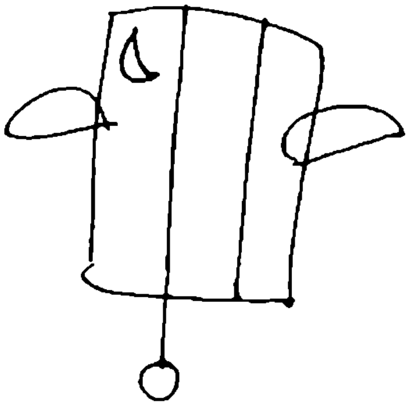

জলছবি

ফার্মগেটে বাসে উঠবার সময় জলিল সাহেবের বাম পায়ের জুতার তলাটা খুলে পড়ে গেল। বাসে উঠবার উত্তেজনায় ব্যাপারটা তিনি খেয়াল করলেন না। শুধু মনে হলো দাঁড়িয়ে তিনি যেন ঠিক আরাম পাচ্ছেন না। বাম পায়ে তেমন জোর নেই।

শাহবাগের কাছে এসে তিনি বসবার জায়গা পেলেন। অফিস টাইমে বসবার জায়গা পাওয়া অসম্ভব ভাগ্যের ব্যাপার। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঝামেলা আছে। তিনি আড়চোখে পাশে বসা লোকটির দিকে তাকালেন এবং শিউরে উঠলেন। লোকটির ঘাড় থেকে কান পর্যন্ত দগদগে ঘা। লালাভ একরকম রস সেখানে থেকে গড়িয়ে পড়ছে। জলিল সাহেবের পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তার পায়ের দিকে। আর তখনই দেখলেন বাম পায়ের জুতার তলাটার কোনো চিহ্নও নেই। এক বছরও হয় নি। এর মধ্যে এই অবস্থা। পাশে বসা লোকটি বলল, ক'টা বাজে ?

ন'টা।

লোকটা রাগী গলায় বলল, আপনার ঘড়িতে তো ন'টা দশ বাজে; ন'টা বললেন কেন ?

জলিল সাহেব তাকিয়ে দেখলেন লোকটির হাতেও ঘা। কুষ্ঠ নাকি ? তিনি বাঁদিকে খানিকটা সরে এলেন। লোকটি পা মেলে যতটুকু জায়গা খালি ছিল সবটুকু ভরাট করে ফেলল।

আপনার জুতার কী হয়েছে ?

জলিল সাহেব জবাব দিলেন না।

খুলে পড়ে গেছে না-কি ?

হ্যাঁ।

বাসের অনেকগুলো লোক উঁকি দিল। যেন দারুণ একটা মজার ব্যাপার। অনেকরকম ছোট ছোট প্রশ্ন হতে লাগল।

কোন সময় খুলল ?

টের পান নাই ? বলেন কী!

কোন কোম্পানির জুতা ? বাটা নাকি ? বাটা জুতার আগের কোয়ালিটি এখন আর নেই।

জুতার দোকানে না গিয়ে অর্ডার দিয়ে বানানোই এখন ভালো। হেসে-খেলে চার-পাঁচ বছর যায়।

জলিল সাহেব লক্ষ করলেন, তার সামনের সিটে বসা দুটি মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে জুতা দেখতে চাচ্ছে। এই গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যেও তামাশা দেখা চাই। একটি মেয়ে আবার ফিক করে হেসে ফেলল। এর মধ্যে হাসির ঠিক কী আছে জলিল সাহেব ভেবে পেলেন না। তার মনে হলো মেয়েরা এখন আর আগের মতো নেই। মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে তারাই সবার আগে হেসে ওঠে। যেমন তাঁর অফিসের ডিসপাস সেকশনের মেয়েটি। কী মায়াকাড়া চেহারা, কী মিষ্টি হাসি। একদিন লাঞ্চের সময় এসে জিজ্ঞেস করল, কী লাঞ্চ আনলেন আজকে ?

তিনি বললেন, রুটি আর আলু ভাজা।

কয়েকদিন পর আবার জিজ্ঞেস করল। সেদিনও তিনি বললেন, রুটি আর আলু ভাজা। তারপর একদিন তিনি শুনেন ডিসপাস সেকশনের সবাই তাকে ডাকছে 'মিস্টার পটেটু ভাজা'।

এইসব তাঁকে বিচলিত করে না। কিন্তু এমন একটা মিষ্টি চেহারার মেয়ে, যে এত সুন্দর করে হাসে, সে কী করে মানুষের কষ্ট নিয়ে তামাশা করে ? তাছাড়া তিনি তার বাবার বয়সী। বিয়ে করলে এত বড় একটা মেয়ে তার নিশ্চয়ই থাকত।

জলিল সাহেবের গুলিস্তানে নামার কথা, কিন্তু তিনি প্রেসক্লাবে নেমে পড়লেন। জুতাটা সারানো যায় কি-না দেখতে হবে। আজকে অফিসে দেরি হবেই। গত এক বছরে তিনি একদিন মাত্র দেরি করেছেন। আজকেরটা নিয়ে হবে দু'দিন। দু'দিন দেরি হলে কিছু হবে না।

কিন্তু সেকশন অফিসার নজমুল হুদা সাহেব তাকে সহ্যই করতে পারেন না। তিনি আসার পর থেকে শুধু খুঁত ধরার চেষ্টা করছেন।

এ-কী জলিল সাহেব, চিঠি লিখছেন ডেট কোথায় ? ডেট ছাড়া চিঠি হয় ? বাইশ বছরে কাজ এই শিখেছেন ? রিপিটিশনের বুঝি এই বানান ? ডিকশনারি দেখতে পারেন না ? অফিসের খরচে তো ডিকশনারি কেনা হয়। সেটা কি শুধু টেবিলে সাজিয়ে রাখবার জন্যে ?

ভাউচারগুলো সই করিয়ে রাখতে বলেছিলাম, এখন দেখি দু'টা ভাউচারে কোনো সই নেই। পেয়েছেন কী আপনি ? বাইশ বছরেও সামান্য কাজটা শিখতে না পারলে কখন পারবেন ?

আসলে আপনার এখন অফিসের কাজে মন নেই। মন থাকলে এরকম হয় না।

মুচি ছেলেটি গম্ভীর মুখে টায়ারের রাবার কাটছে। বয়স তের-চৌদ্দর বেশি হবে না, কিন্তু কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ফসফস করে সিগারেট টানছে। এক পোচ রাবার কাটে আর গম্ভীর হয়ে সিগারেটে টান দেয়। ভাবখানা যেন রাবার কাটার মতো জটিল কাজ এ পৃথিবীতে আর তৈরি হয় নি। বহু কষ্টে ছেলেটির গালে চড় মারার ইচ্ছা দমন করে জলিল সাহেব টুল কাঠের বাক্সের ওপর বসে-বসে ঝিমুতে লাগলেন। এগারোটা সাত মিনিটে জুতা তৈরি হলো। জলিল সাহেব সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ছেলেটি ডেকে তুলল তাকে।

না বয়স হয়ে যাচ্ছে। নয়তো এরকম অসময়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে ? নজমুল হুদা সাহেব ঠিকই বলেছিলেন, বয়স হয়ে গেছে, এখন অফিস ছেড়ে বাড়িতে বিশ্রাম করেন। অফিসের কাজ আর আপনাকে দিয়ে হবে না।

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় তিনি অফিসে পৌঁছলেন। তাঁর মনে হলো কিছু একটা হয়েছে। ডিসপাস সেকশনের আমিন সাহেব কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকালেন।

জুতাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, ঠিক করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

আমিন সাহেব কোনো কথা বললেন না।

রাবারের সোল লাগিয়েছি। দশ টাকা লাগাল।

আমিন সাহেব শুধু বললেন, ও তাই বুঝি ?

ডিসপাসের ঐ মেয়েটি হেডক্লার্কের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন কথা বলছিল। জলিল সাহেবকে দেখেই থেমে গেল। এর মানে কী ? জলিল সাহেব কৈফিয়তের স্বরে বললেন, জুতার শুকতলিটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।

মেয়েটি শীতল স্বরে বলল, বড়সাহেব আপনাকে খুঁজছিলেন।

কখন ?

সাড়ে দশটার দিকে।

কী জন্যে?

তার কাছ থেকেই শুনবেন।

জলিল সাহেব নিঃশব্দে তার টেবিলে গিয়ে বসলেন। টেবিলের উপর ক্লিয়ারেন্সের দু'টি ফাইল ছিল। তার একটিও নেই। তিনি চেয়ারে বসে ঘামতে লাগলেন। পাশের টেবিলের সুভাস বাবু মৃদুস্বরে বললেন, কোনোদিন দেরি করেন না। আজকে দেরি করলেন?

জলিল সাহেব বিড়বিড় করে কী বললেন ঠিক বুঝা গেল না।

আপনার ফাইল দু'টা নাজমুল হুদা সাহেব নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আমাকে দেখে দিতে বলছেন।

জলিল সাহেব কিছু বললেন না।

আপনাকে বড় সাহেব দেখা করতে বলেছেন, যান দেখা করে আসেন।

জলিল সাহেব নড়লেন না। ফ্যানের ঠিক নিচেই তার চেয়ার। তবু তিনি কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন।

আজ সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে কী বলবেন তিনি? যার বাড়িতে তিনি মাসে তিনশ' পনেরো টাকা দিয়ে থাকেন এবং খান সে তার দূরসম্পর্কের ভাই। তবু সে তাকে নিশ্চয় দশ দিনের মধ্যে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। দশ দিন পর নতুন মাস শুরু হচ্ছে। নতুন মাস থেকে অন্য একজন কাউকে সে নেবে। না দিলে তার সংসার চলবে না। তার বৌটি অবশ্যি খুব কষ্ট পাবে। এই মেয়েটি অন্য মেয়েগুলোর মতো না। এই মেয়েটির মধ্যে দয়ামায়া আছে। বড় ভালো মেয়ে।

জলিল সাহেব।

জি।

বসে আছেন কেন? যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসেন।

যাই।

জলিল সাহেব উঠলেন না, বসেই রইলেন। তার দারুণ তৃষ্ণাবোধ হলো। একটি বেয়ারা আছে তাকে বললেই সে পানি এনে দেয়। কিন্তু তাকেও তিনি কিছু বললেন না। প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে ফ্যানের নিচে বসে তিনি কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন।

প্রাইভেট কোম্পানি, চাকরি চলে গেলে টাকা পয়সা তেমন কিছুই পাওয়া যাবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডে অল্প যা কিছু ছিল তার প্রায় সবটা নিয়েই বাবার শেষ

চিকিৎসা করতে হলো। জানতেন টাকাটা জলে যাচ্ছে, তবু করতে হলো। বিনা চিকিৎসায় মরতে দেয়া যায় না। ক্যান্সার, বাঁচার কোনো আশা নেই জেনেও তিন হাজার টাকা খরচ করে অপারেশন করাতে হয়।

ডাক্তার সাহেব নিজেও নিষেধ করেছিলেন, এই বয়সে অপারেশন শক সহ্য হবে না। বাড়িতে নিয়ে যান, শান্তিতে মরতে দেন। অপারেশন সাকসেসফুল হলেও লাভ নেই তেমন কিছু। বড়জোর বছরখানেক বাঁচবেন।

কিন্তু বাবা ক্ষেপে উঠলেন অপারেশনের জন্যে। রোজ দু'বেলা জিজ্ঞেস করেন, অপারেশন কবে ? তাড়াতাড়ি করা দরকার। এইসব জিনিস যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভালো।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে মোট পাঁচ হাজার আটশ' টাকা পাওয়া গিয়েছিল (আসলে ছ'হাজার। দু'শ' টাকা পান খাওয়ার জন্যে দিতে হয়েছে)। তার মধ্যে খরচ হলো তিন হাজার। বাকি টাকাটা ফেরত দিয়ে ফেলবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু ফেরত দিতে ইচ্ছা করছিল না। এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতে মায়া লাগে। সব চকচকে নোট। হাতে নিয়ে থাকতেও আনন্দ। নতুন জুতা কিনে ফেললেন একজোড়া, একটা মশারি কিনলেন। আগের মশারিটি দিয়ে তিনটি নারকেল পাওয়া গেল। সদরঘাটের পুরনো কাপড়ের দোকান থেকে ছাপান্ন টাকার কোট কিনলেন একটা। এই কোটটিই তার কাল হয়েছিল। কোটের পকেট থেকেই বাকি টাকাগুলো পকেটমার হয়। সব নতুন নোট। তিনি সেদিন অফিসে না গিয়ে রেসকোর্সের মাঠে একটা গাছের নিচে সারা দুপুর বসে ছিলেন। রেসকোর্সের মাঠটাকে গাছটাছ লাগিয়ে যে এত চমৎকার করা হয়েছে তা তিনি জানতেন না।

লাঞ্চ আওয়ারে বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন।

বড় সাহেবের ঘরে এয়ারকুলার আছে। সেটি বোধহয় কাজ করছে না। জলিল সাহেবের গরম লাগছে। প্রচণ্ড গরম। বড় সাহেবের পাশে নাজমুল হুদা সাহেব বসে আছেন। চেক-চেক শার্টের জন্যে তাঁর বয়স খুব কম লাগছে। কিন্তু শার্টের ছাপাটা ভালো না। কেমন যেন চোখে লাগে। জলিল সাহেবের চোখ কড়কড় করতে লাগল।

জলিল সাহেব।

জি স্যার।

বসেন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

জলিল সাহেব বসলেন।

সকালবেলার দিকে একবার আপনার খোঁজ করেছিলাম।

জলিল সাহেব জুতা ছেঁড়ার ব্যাপারটা বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। গলায় কথা আটকে গেল। বড় সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, হেড অফিস থেকে চিঠি এসেছে। তারা আপনাকে অফিসার্স গ্রেডে প্রমোট করেছে। আপনার সার্ভিসে হেড অফিস খুব স্যাটিসফায়েড।

জলিল সাহেব শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন।

নজমুল হুদা সাহেবের পাশের কামরাটাতে আপনি আপাতত কাজ শুরু করুন। জিনিসপত্র কিছু লাগলে রিকুইজিশন স্লিপ দিয়ে স্টোর থেকে নিয়ে নেবেন।

বড় সাহেব হাত বাড়িয়ে বললেন, কনগ্রাচুলেশন!

হাতটি যে হ্যান্ডসেকের জন্যে বাড়ানো জলিল সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না। যখন বুঝতে পারলেন তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি ধরাগলায় বললেন, স্যার, জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করে নি। একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে। খুব ব্যথা লাগছে।

ক্যান্টিনে সবাই বোধহয় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে আসতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। ডিসপাস সেকশনের মেয়েটি হাসিমুখে বলল, স্যার, আপনার সম্মানে আজ আমরা সবাই দুপুরে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়া করব। নজমুল হুদা সাহেবও খাবেন আমাদের সঙ্গে।

কিছু একটা বলা দরকার। সবাই হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জলিল সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করে নি। একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে।

কাদের মিয়া বিরিয়ানি এবং একটি করে টিকিয়া আনতে স্টেডিয়ামে গেছে। জলিল সাহেব তাঁর নিজের লাঞ্চ বাক্সটি হাতে করে চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা করছিল ডিসপাস সেকশনের মেয়েটিকে লাঞ্চ বক্সটি খুলে দেখান। কারণ সেখানে রুটি এবং আলু ভাজা ছাড়াও একটা খেজুর গুড়ের সন্দেশ আছে। রোজ-রোজ এক জিনিস খেতে কষ্ট হয় ভেবেই বাড়ি থেকে মেয়েটি দিয়ে দিয়েছে। তিনি খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি শোনে নি। মেয়েজাতটা হচ্ছে মায়াবতীর জাত। শুধু শুধু মায়া দেখায়। জলিল সাহেবের চোখ আবার ভিজে উঠল। ডিসপাস সেকশনের মেয়েটি বলল, স্যার, আপনার কষ্ট হচ্ছে। আপনি বরং জুতাটা খুলে রাখেন।

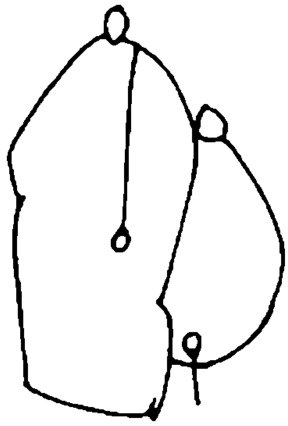

খেলা

খায়রুন্নেসা গার্লর্স হাইস্কুলের থার্ড স্যার, বাবু নলিনি রঞ্জন একদিন দুপুরবেলা দাবা খেলা শিখে ফেললেন। এই খেলাটি তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। দুজন লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা বোর্ডের দিকে বিরক্তিকর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকবে; মানে হয় কোনো ? তবু তাঁকে খেলাটা শিখতে হলো। জালাল সাহেব জিওগ্রাফি স্যার, তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু। জালাল সাহেবের কথা ফেলতে পারলেন না। টিফিন টাইমে তিনি শিখলেন বড়ে কীভাবে চলে, ঘোড়া কী করে আড়াই ঘরের লাফ দেয়, গজ শুঁড় উঁচু করে কোণাকুণি দাঁড়িয়ে থাকে। জালাল সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, ব্রেইনের খেলা, বুঝলে পণ্ডিত ? বুদ্ধির চর্চা হয়।

বুদ্ধির চর্চা কী করে হয় নলিনি বাবু সেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না, কিন্তু প্রথম খেলাতেই জালাল সাহেবকে হারিয়ে দিলেন। জালাল সাহেব ফ্যাকাশেভাবে হাসতে হাসতে বললেন, হেলাফেলা করে খেলেছি বলে এই অবস্থা। হবে নাকি আরেক দান ?

আরেক দানের সময় ছিল না। ফোর্থ পিরিয়ডে ইংলিশ কম্পোজিশন। নলিনি বাবু উঠে পড়লেন। ক্লাসে ভালো পড়াতে পারলেন না। মাথার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে দাবা খেলাটা ঘুরতে লাগলে। এরকম তাঁর কখনো হয় না।

ছুটির পর দুহাত খেলা হলো। জালাল সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখি চিন্তাভাবনা করে ডিফেনসিভ খেলা দরকার।

তৃতীয় খেলাটিতে জালাল সাহেব প্রচুর চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তাঁর আছরের নামাজ কাজা হয়ে গেল। খেলা চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। দফতরি বাচ্চু মিয়া ঘর বন্ধ করতে না পেরে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বারান্দায় হাঁটহাটি করতে লাগল।

খেলার শেষে জালাল সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। নলিনি বাবু বললেন, তুমি দেখি মনমরা হয়ে গেছ।

জালাল সাহেব বললেন, আরেক হাত খেল। লাস্ট দান। এইবার আর পারবে না, খুব ডিফেনসিভ খেলব।

আজ থাক। ট্যুইশনি আছে।

কতক্ষণ আর লাগবে! খেল দেখি।

শেষ খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। জালাল সাহেব ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। নলিনি বাবু বললেন, চল যাওয়া যাক।

আরেক হাত খেল।

আর না, রাত হয়েছে।

খেল তো, রাত বেশি হয় নাই।

নলিনি বাবু আবার বসলেন। তাঁর জয়যাত্রা শুরু হলো। নিয়ামতপুরের লোকজন কিছুদিনের মধ্যেই জেনে গেল এ শহরে অসম্ভব ভালো একজন দাবাড়ু আছেন। তাঁকে কেউ হারাতে পারে না। তাঁর সেই খ্যাতি পরের পনেরো বছর পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রইল।

পনেরো বছর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে তাঁর দুটি দাঁত পড়ল। বাঁ চোখে ছানি পড়ল। এবং তিনি অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার হিসেবে শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে রিটায়ার করলেন। তার বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে লেখা মানপত্রে বলা হলো— 'বাবু নলিনি রঞ্জন দাবার জগতের একজন মুকুটহীন সম্রাট। তিনি বাংলাদেশ দাবার চ্যাম্পিয়ন জনাব আসাদ খাঁকে পর পর তিনবার পরাজিত করে দাবার জগতে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।'

কথাটি সত্যি। আসাদ খাঁর শালীর বাড়ি নিয়ামতপুর। তিনি কোনো এক অশুভক্ষণে শালীর বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন এবং কৌতূহলী হয়ে খেলতে বসেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল মফস্বলে যা হয়ে থাকে মোটামুটি ধরনের একজন খেলোয়াড়কে নিয়ে সবাই মাতামাতি করে, এও সেরকম। খেলতে বসেও তার সে ভুল ভাঙল না। তিনি দেখলেন রোগা এবং বেটে এই লোকটি ওপেনিং সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। যারা সাধারণ দু একটা বইটই পড়েছে তারাও যেসব জানে এ লোকটি স্বাভাবিক কারণেই সেসব কিছু জানে না। যার ফলে পঞ্চম চালের ম্যথায় আসাদ খাঁ নলিনি বাবুর রাজার সামনের বড়েটি নিয়ে নিলেন। তিনি অবহেলার একটা হাসিও হাসলেন। কিন্তু সেই হাসি তাঁর ঠোঁটে ঝুলে পড়ল যখন দেখলেন কৃশকায় এই বেঁটে লোকটি তার দুটি ঘোড়া নিয়ে

হঠাৎ করেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আসাদ খাঁ খুবই অবাক হলেন, কিন্তু নিয়ামতপুরের লোকজন এমন ভাব করতে লাগল যে, এর কাছে হারার মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই।

আসাদ খাঁর সে-বছর শালীর বাড়ি বেড়াতে আসার সমস্ত আনন্দ ধুয়ে মুছে গেল। নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকায় লেখা হলো— 'নিয়ামতপুর নিবাসী প্রবীণ দাবাড়ু, খায়রুন্নেসা গালর্স হাইস্কুলের শিক্ষক বাবু নলিনি রঞ্জন বাংলাদেশ দাবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, নিয়ামতপুরে গৌরব এই কীর্তিমান দাবাড়ু বিগত দশ বৎসরে কাহারো নিকট পরাজিত হন নাই ...।'

ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি। নলিনি বাবু শুধু জিতেই গেছেন। অনেক দূর দূর থেকে লোকজন খেলতে আসত তার সঙ্গে। একবার দাবা ফেডারেশনের সেক্রেটারি এক বিদেশীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এতবড় ঘটনা নিয়ামতপুরে আর ঘটে নি। যারা দাবা খেলার কিছুই বুঝে না, তারাও এসে ভিড় করল। টিফিনের পর খায়রুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল ছুটি হয়ে গেল। ফেডারেশনের সেক্রেটারি দু'বার বললেন, আপনি খুব সাবধানে খেলবেন। যাকে নিয়ে এসেছি তিনি বেলজিয়ামের লোক। খুব উঁচুদরের খেলোয়াড়।

আমি সাবধানেই খেলি।

তাড়াহুড়া করে চাল দেবার দরকার নাই, বুঝলেন?

নলিনি বাবু মাথা নাড়লেন, বুঝেছেন।

এঁর সঙ্গে গিয়াকো পিয়ানো ডিফেন্স খেলাই ভালো। সেই ডিফেন্স জানেন তো?

জি-না। জানি না।

সেক্রেটারি সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। সেই কুঞ্চন আরো গাঢ় হলো যখন দেখলেন, নলিনি বাবু পিকে ফোর-এর উত্তরে আর ফোর দিয়ে বসে আছেন।

কী করছেন আপনি? এঁর সঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করছেন নাকি? এটা কী দিলেন?

সাহেবটিও ইংরেজিতে কী যেন বলল। বাবু নলিনি রঞ্জন ইংরেজির শিক্ষক, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। সেক্রেটারি সাহেব মুখ কালো করে বললেন, প্রশিক্ষণহীন প্রতিভা দেখাতে নিয়ে এসে বড় বেইজ্জতীর মধ্যে পড়লাম দেখি।

খেলা হলো তিনটি। একটি ড্র হলো, দু'টিতে নলিনি বাবু জিতে গেলেন। সেক্রেটারি সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আপনি ঢাকাতে খেলতে আসেন না কেন ?

ট্যুইশনি আছে। তাছাড়া শরীরটা ভালো না। হাঁপানি।

আরো না না। আপনি আসবেন ভাই।

দরিদ্র মানুষ, টাকা-পয়সা নাই।

আরে আপনি আবার কিসের দরিদ্র ?

সেক্রেটারি সাহেব জড়িয়ে ধরলেন নলিনি বাবুকে।

কাজেই শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে বাবু নলিনি রঞ্জনের বিদায় সংবর্ধনায় বার বার ঘুরে ফিরে দাবার কথা এলো। এবং সভার শেষে সভাপতি, স্কুল কমিটির সেক্রেটারি ও পৌরসভা চেয়ারম্যান, সুরুজ মিয়া অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন যে, নিয়ামতপুরের গৌরব দাবার অপরাজের নক্ষত্র বাবু নলিনি রঞ্জনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তিনি একটি ব্যবস্থা করেছেন। পনেরো হাজার টাকার একটি চেক দিচ্ছেন স্কুল ফান্ডকে। যদি কেউ নলিনি বাবুকে হারাতে পারে তাহলে তাকে এই টাকাটি দেয়া হবে। আর যদি কেউ হারাতে না পারে, তাহলে স্কুল ফান্ড নলিনি বাবুর মৃত্যুর পর এই টাকাটা পাবে।

সভায় তুমুল করতালি হলো। হেডমাস্টার সাহেবকে পনেরো হাজার টাকার চেকটি উঁচু করে সবাইকে দেখাতে হলো। সুরুজ মিয়া যে এমন একটি নাটকীয় ব্যাপার করতে পারেন তা কারো কল্পনাতেও আসে নি।

আশ্বিন মাসের এক সন্ধ্যায় নলিনি বাবুর হাপানির টান খুব প্রবল হলো। বাতাস তার কাছে ক্ষীণ মনে হলো। ফুসফুস ভরাবার জন্যে তিনি প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর গলার কাছে একটি রগ বার বার ফুলে উঠতে লাগল। এই অবস্থাতেও তিনি তাঁর জীবনের শেষ খেলাটি খেলতে বসলেন। এই খেলাটি তিনি খেলবেন হারবার জন্যে। তিনি আজ হারবেন তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু জালাল সাহেবের কাছে। জালাল সাহেব পনেরো হাজার টাকা জিতে নেবেন। সেই টাকায় নলিনি বাবুর চিকিৎসা হবে। শীতের জন্যে গরম কিছু কাপড় কিনবেন, শীতে বড় কষ্ট হয় তার।

খেলা হচ্ছে স্কুলঘরে। জালাল সাহেব চ্যালেঞ্জের খেলা খেলছেন। অনেকেই এসেছে কৌতূহলী হয়ে। নলিনি বাবুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। একটা ভুল চালে তাঁর গজ খোয়া গেল। তার কিছুক্ষণ পর একটা নৌকা পিনড হয়ে গেল। অস্ফুট গুঞ্জন উঠল চারদিকে। নলিনি বাবু দেখলেন জালাল সাহেবের চোখ দিয়ে

জল পড়ছে। পনেরো বছরের অপরাজেয় দাবা চ্যাম্পিয়ন আজ পরাজিত হতে যাচ্ছেন। জালাল সাহেবের মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। চাল দেবার সময় তাঁর হাত কাঁপতে লাগল।

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সোবহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, নলিনি বাবুর অবস্থা তো খুব খারাপ।

জালাল সাহেব ধরা গলায় বললেন, সব আমাদের নলিনির ভান, দেখবেন এক্ষুনি সব ঠিক করে ফেলবেন।

নলিনি বাবু ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুমি কাঁদছ নাকি জালাল?

না। চোখে কী যেন পড়ল।

জালাল সাহেব চোখের সেই অদৃশ্য জিনিসটা বের করবার জন্যে চোখ কচলাতে লাগলেন।

ক্ষীণ একটি হাসির রেখা কি দেখা গেল নলিনি বাবুর চোখে? তিনি ঘোড়ার একটি কিস্তি দিলেন। রাজা সরে এলো এক ঘর। দ্বিতীয় কিস্তি দিলেন বড়ে দিয়ে, রাজা আরো এক ঘর সরল। নলিনি বাবু যেন অদৃশ্য কোনো নগরী থেকে তাঁর কালো গজটি বের করে আনলেন। সোবহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কী সর্বনাশ! নলিনি বাবু গজটা বড়ের মুখে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কিস্তি।

জীবনের শেষ খেলাটিতে বহু চেষ্টা করেও তিনি হারতে পারলেন না। সহায় সম্বলহীন অসহায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় নিয়ামতপুরের গৌরবের মৃত্যু হলো ১২ই নভেম্বর ১৯৭৫ সন। রোজ মঙ্গলবার। খায়রুন্নেসা গার্লস স্কুল সে উপলক্ষ্যে দুদিন ছুটি থাকল।

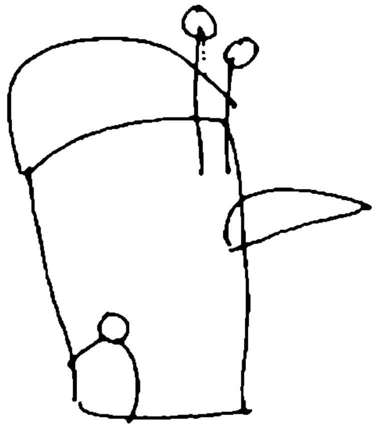

শিকার

সে হাঁটে নিঃশব্দে।

যখন হাঁটে বাতাস পর্যন্ত কাঁপে না। নৈঃশব্দের চলাফেরা। কিন্তু মতি মিয়া টের পায়। অন্ধ মানুষদের এই একটি সুবিধা। এরা বাতাস শুঁকে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। আজও পারল। মাথা ঘুরিয়ে বলল, কেডা যায়? আজরফ নাহি?

আজরফ জবাব দিল না। যে নিঃশব্দে হাঁটে সে ফস করে জবাব দেবে এটা আশা করা যায় না। মতি মিয়া আশাও করে না। দ্বিতীয়বার ডাকে, আজরফ! ও আজরফ মিয়া!

আজরফ জবাব দেয় না। জবাব দেয় তার পোষা বক। বকটির বয়স মাত্র পাঁচ, কিন্তু সে নব্বই বছরের বুড়োর মত ডাকে— কক কক ককর। বড় কুৎসিত ডাক। মতি মিয়া নড়ে চড়ে উঠে।

আজরফ, বক ধরতে যাস নাহি?

হ।

যাইস না বাজান। সোনা চান আমার।

আজরফ চুপ করে থাকে।

পক্ষী ধরণ বালা না। বদদোয়া লাগে। আমারে দেইখ্যা বুঝস না? ও আজরফ। আজরফ মিয়া।

কী?

ব' তুই। তরে একটা গফ কই। ক্যামনে বদদোয়া লাগে হেই গফ।

আজরফ বসে না। গল্পের প্রসঙ্গ আসায় খাঁচার বকটি সম্ভবত উৎসাহী হয়। সে ডানা ঝাপ্টায় এবং দ্বিতীয়বার ডাকে— কক কক কক। মতি মিয়া জুত হয়ে বসে। কার্তিক মাসের নরম রোদ তার পিঠে। রোদের মধ্যে নেশাজাতীয় কিছু কি আছে? কেমন যেন নেশা নেশা ভাব হয়, বড় ভালো লাগে মতি মিয়ার। এই বয়সে শরীর বাড়তি উত্তাপ চায়। মতি মিয়ার প্রতি রাতেই ইচ্ছা করে চারপাশে আগুন করে মাঝখানে বসে থাকতে। কিন্তু এখন মাত্র কার্তিক মাস। শীতও ভালো করে পড়ে নি।

আজরফ আছস?

হ।

বকপক্ষীর কথা কই। বড় হারামি পক্ষী। বুঝছস?

বুঝলাম।

যে বক ধরে তার চউখ থাকে না। চউখ তার যায়। আইজ হউক, কাইল হউক— চউখ যায়। আমারে দেইখ্যা বুঝস না?

বকপক্ষীর হারামিপনা বুঝাবার জন্যে মতি মিয়া তার বুজে যাওয়া চোখ মেলতে চেষ্টা করে। মেলতে অবশ্যি পারে না।

অ আজরফ!

কও হুনতাছি।

ব' আজরফ।

আজরফ বসে না। মতি মিয়ার পিঠে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। মতি মিয়া গানের মতো সুরে কথা বলে, বকপক্ষী মরণ ঠোকর দেয়, বুঝছস? আর ঠোকর দেয় জায়গামতো। পরথম ধাক্কায় যায় ডাইন চউখ, পরের ধাক্কায় বাঁও। দুনিয়া হয় আন্ধাইর। নয়নের মতো জিনিস নাইরে বাজান।

আজরফ শুনছে কি শুনছে না মতি মিয়া বুঝতে পারে না। খাঁচায় বন্দি বক ডানা ঝাপ্টায়। মতি মিয়া তাতেই উৎসাহ বোধ করে।

বক-মারার চউখ থাকে না রে আজরফ। আমারে দেইখ্যা বিবেচনা কর। নেজামের ভাইস্তার কথা মনে আছে?

কোন নেজাম?

মতি মিয়া উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে। নেজামের ভাইস্তার গল্প সবিস্তারে শুরু করে। কথা বলতে তার বড় আরাম লাগে। তাছাড়া পিঠের উপর কার্তিক মাসের চমৎকার রোদ। রোদের মতো ভালো জিনিস আছে। এক পর্যায়ে ঝিমুনি এসে যায় মতি মিয়ার।

আজরফ বসে থাকে উত্তরবন্দের নাবালে একটা জলা জায়গায়। তার এক হাতে বক ধরার ফাঁদ। কাঁচা বেতপাতা দিয়ে ঢাকা গোল করে বাঁধা একটা চাটাই। বকরা ক্ষীণদৃষ্টির পাখি। ফাঁদটাকে তাদের কাছে মনোরম একটা ঝোপের মতো লাগে। দড়ি দিয়ে বাঁধা পোষা বকটি বসে থাকে চাটাইয়ের মাথায়। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন ডাকে। সেই কর্কশ ডাকে বকদের প্রতি কোনো করুণ আবেদন থাকে নিশ্চয়ই। কারণ মুক্ত বকের দল তখন মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। পোষা বকটি ক্রমাগত ডাকে। বকরা নিচে নেমে আসে। সন্দেহভরা চোখে তাকায়, তবু নেমে আসে। এবং একসময় পোষা বকটির পাশে এসে বসে। গভীর মমতায় কিছু হয়তো বলতে চায়। কিন্তু সে সুযোগ হয় না। বক শিকারি একহাতে খপ করে তার পা ধরে বিদ্যুৎগতিতে তাকে নামিয়ে এনে পায়ের নিচে চাপা দেয়। দ্রুত হাত খালি করতে হয়। কারণ অন্য আরেকটি বক নামতে শুরু করেছে। সময় নেই মোটেই। বক নিচে নামনোর সময়টাই ভয়াবহ। হতচকিত পাখিটি একবার হলেও মরণ ঠোকর দিতে চেষ্টা করে। সে তখন খুঁজে মানুষের চোখ। একটা নরম তুলতুলে জায়গা যেখানে ঠোঁট অনেক খানি বসিয়ে দেয়া যায়। বক-মারার চোখ যায় বকের ঠোঁটে। প্রথমে ডানটি তারপর বাঁটি।

আজ পাখিরা আসছে না। বেলা হয়ে গেছে বোধহয়। রোদ চড়ে গেলে পাখিরা নিচে নামতে চায় না। আজরফ তাকাল আকাশের দিকে। আকাশ শূন্য এবং ঘন নীল। এমন নীল যে দৃষ্টি পিছলে যায়। তাকিয়ে থাকলে মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হয়। শূন্য নীল আকাশের মতো অদ্ভুত জিনিস আর আছে নাকি ?

কিছু পাইছ আজরফ ?

আজরফ তাকিয়ে দেখল মেম্বর সাব। মেম্বারজাতীয় লোকরা সবার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথা বলে। এরা কথা বলতে বড় পছন্দ করে।

ওখনো মনে হয় কিছু পাও নাই ?

জি-না।

কেমন ধরা পড়ে ও আজরফ ?

ঠিক নাই। কোনোদিন আট-দশটাও পাই।

কও কী ! দুই টেকা কইরা বেচলেও তো বিশ টাকা। কত কইরা ?

ঠিক নাই।

আজরফের কথা বলতে ভালো লাগে না। সে তাকায় আকাশের দিকে। দূরে একটি বক চক্কর খাচ্ছে। এটি কি নামবে ? পোষা বকটি উত্তেজিত হয়ে

উঠছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে। আজরফ নিজের মনেই বলে, ডাক দেরে অনুফা। তর বন্ধুরে ডাক দে দেহি। পোষা বক (যার গোপন নাম অনুফা) ডাকে না, তৃষ্ণার্ত চোখে তাকায় আকাশের দিকে। মেম্বর সাহেবও তাকান। তারপর একসময় রবারের জুতায় জলভূমিতে ছপ ছপ শব্দ তুলে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে গিয়ে উঠেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছাতা নেড়ে বলেন, যাইরে আজরফ।

আজরফ তাকায় তার দিকে, ঠিক তখনি তাঁর বাঁ চোখ টন টন করে উঠে। চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করে। এটা খুব খারাপ লক্ষণ। এর মানে হচ্ছে বাঁ চোখটির সময় শেষ হয়ে এসেছে। ধরা পড়া বকগুলির কোনো একটি ঠোকরে তুলে নেবে বাঁ চোখ। কিংবা হয়তো পোষা বকটি মরণ ঠোকর দেবে । বড় হারামি পাখি। আজরফ তাকাল অনুফার দিকে। ফাঁদের মাথায় শান্ত ভঙ্গিতে সে বসে আছে। আজরফের চোখে জল জমে আছে বলেই সবকিছু অন্যরকম দেখাচ্ছে। ছোট্ট অনুফাকে দেখাচ্ছে প্রকাণ্ড সারস পাখির মতো। তার ঠোঁট দুটি সুবিশাল।

আজরফ শার্টের হাতায় চোখ মুছল, কিন্তু জল পড়া বন্ধ হলো না। যাবে, এবার বাঁ চোখটা যাবে। আজই বোধহয় যাবে।

সফদর আলির এরকম হলো। কথা নেই বার্তা নেই শুধু ডান চোখ দিয়ে জল পড়ে। সফদর ভাই দেখা হলেই বলত, ডাইন চউখটা এইবার যাইব। বুঝছস আজরফ? এইটা নিশানা।

ক্যামনে কন?

চউখের নিজের একটা জীবন আছে। হে বুঝে।

কথা ঠিক। তাঁর চোখ সত্যি সত্যি গেল। ভয়াবহ ব্যাপার! সফদর ভাইয়ের ভয়ংকর চিৎকারে নবীনগরের সমস্ত মানুষের বুক কাঁপতে লাগল। পাখিরা কি কিছু বুঝতে পারে? সফদর ভাইয়ের পোষা বক (যার নাম সোনা) ক্রমাগত ডাকতে লাগল, কক কক রুক। সেই ডাক বেদনার ডাক, না আনন্দ উল্লাসের ডাক?— কোনোদিন জানা যাবে না।

সদর হাসাপাতাল নেত্রকোনায়। নৌকায় যেতে লাগে দু'দিন। ন্যাকড়া পোড়া ছাই দিয়ে চোখ বেঁধে নৌকায় তোলা হলো সফদর আলিকে। মাথার কাছে বসে রইল আজরফ আর সফদর আলির ছোট ছেলেটা যার নামও সোনা। বড় খারাপ যাত্রা ছিল সেটি। এককেবার মাথা তুলে হো হো করে চিৎকার করে উঠত সফদর। তার ছেলেটাও তখন অবিকল বাবার মতো চেঁচাত, হো হো।

সদর হাসপাতালের বারান্দায় চারদিন শুয়ে থেকে পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হলো। চোখ বিষিয়ে গিয়েছিল।

আজরফ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। দু'একটা সঙ্গীহীন বক উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এরা এখন ঘুরবে। একা একা ঝাঁক বাঁধার সময় এখনো হয় নি। ঝাঁক বাঁধা হবে আরো দু'মাস পর। তখন বকগুলি অন্যরকম হয়ে যাবে। পোষা বকের ডাকে আর নিচে নামবে না। কেন নামবে না? জগতে অনেক অমীমাংসিত রহস্য আছে। এ জগত বড় রহস্যময়। চোখ যাবার সময় হলে সে কাঁদে। কেন কাঁদে? আজরফ লুঙ্গির একপ্রান্ত টেনে চোখ মুছল। বড্ড জল পড়ছে। বেচারা খুব কাঁদছে। বোধহয় মরতে চায় না।

অনুফা মাথাটা কাত করে তাকে দেখছে। তার ছোট্ট চোখ দুটি টকটকে লাল। সে হঠাৎ কক কক করে ডেকে উঠল। সে কি কিছু বুঝে ফেলেছে নাকি? বুঝে ফেলেছে যে আজ পাখি-মারা আজরফের বাঁ চোখটি যাবে। আর সে আসবে না ফাঁদ নিয়ে। উত্তরবন্দের নাবাল জমিটায় চুপচাপ এসে বসে থাকবে না।

পশুপাখিরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। মতি মিয়ার ধারণা, ওরা মানুষের চেয়েও অনেক বেশি জানে। বেশি জানে বলেই গৃহস্তের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে কুপাখি আসে। কু ডাক ডেকে বারবার উড়ে উড়ে যায়। গৃহস্তের পোষা কুকুর কাঁদে উঁ উঁ করে। দীর্ঘদিনের বাস্তুসাপ হঠাৎ করে ঘর ছেড়ে যায়। মতি মিয়া বলে, বুঝছস আজরফ, পশুপাখি খুব বুঝদার। এইডা আমার কথা না, হযরত সোলায়মান আলায়হিস সালামের কথা। তারা সব বুঝে। সব না বুঝলে চউক্ষে ক্যান ঠোকর দেয়? শইলে জায়গা তো আরো আছে। আছে না? তুই ক' দেহি?

আকাশে বকগুলি চক্কর দিতে দিতে নিচে নামতে শুরু করেছে। অনেকগুলি পাখি একসঙ্গে। এরকম তো হয় না। তাছাড়া রোদ চড়ে গেছে, এই সময় ওরা নিচে নামে না। এখন নামছে কেন? ওরা কি সত্যি সত্যি টের পেয়েছে কিছু?

আজরফের মনে হলো আজ বেশ কিছু সাহসী পাখি স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়েই নিচে নামতে শুরু করেছে। এদের ঠোঁট অসম্ভব ধারালো এবং নিশানা অব্যর্থ। আজ এরা একের পর এক ধরা দেবে। কোনোই বাঁধা দেবে না। এতটুকুও চমকাবে না। তারপর তাদের একজন বিদ্যুৎগতিতে ঠোঁট বসাবে তরল মাংসে। সেই পাখিটি হবে সতেজ স্বাস্থ্যবান পাখি। তার বসার ভঙ্গি হবে ঋজু ও গর্বিত। তার পালক হবে দুধের মতো সাদা। আজরফের পোষা বকটির মধ্যে অস্থিরতা দেখা গেল। সে ডাকল এবং ডাকতেই থাকল। পাখিরা চক্রাকারে নেমে আসছে। আজই সেই দিন। আজরফের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম

জমল। তৃষ্ণা বোধ হলো। নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন। পেটের মধ্যে কিছু একটা পাক খাচ্ছে। বমি আসছে।

পাখি ধরা ছেড়ে দিলে কেমন হয় ? ছেড়ে দেয়া কি যায় না ? এই মুহূর্তেই তো সে অনুফার বাঁধন খুলে দিতে পারে। পারে না কি ? ছেড়ে দিলেই অবশ্যি সে যাবে না। ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকবে। বন্দি জীবনেরও একটা মায়া আছে। গত বৎসরও সে একবার তার বক ছেড়ে দিল। সেই বকটির নাম ছিল অন্তু। অন্তু ছাড়া পেয়েও উড়ে গেল না। ভীষণ অবাক হয়ে বার বার আজরফের মাথার উপর দিয়ে উড়তে লাগল। আজরফ বলল, যারে বেটা যা। পাখি ধরা ছাড়লাম। তুই যা।

অন্তু গেল না। চাটাইয়ের মাথায় বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে থাকলে।

যারে বেটা, পাখি-মারার কাম আর করতাম না। তুই যা।

অন্তু তবু বসেই রইল। তারপর একসময় খুবই অবাক হয়ে উড়ে গেল।

মতি মিয়ার ধারণা বক শিকারি কখনো শিকার ছাড়তে পারে না। বড় পাজি নেশা। জীবন্ত কিছু ধরে ফেলার মতো কড়া নেশা আর কিছু নেই। তাই পাখি-মারারা প্রতিবছরই একবার বলে, পাখি ধরা ছাড়লাম গো। আর না। বহুত হইছে।... তারপর দিন কাটায় খুবই বিষণ্নভাবে। কিছুতেই তখন আর মন বসে না। পরের বৈশাখে আবার সে বকের ছানা এনে পুষতে শুরু করে। কার্তিক মাসে সেই পোষমানা বক নিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে ঘর ছেড়ে বের হয়। লোকজন বলে, কী মিয়া, আবার শুরু করলা ?

এই এট্টু।

পাখি-মারারা চোখ না যাওয়া পর্যন্ত ফিরতে পারে না। প্রথমে যায় একটি। নেশা তখন আরো বাড়ে। রক্তের মধ্যে ঝমঝম শব্দ হতে থাকে। কক কক ডাক শুনলেই স্নায়ু কাঁপতে থাকে উল্লাসে। তারপর যায় দ্বিতীয় চোখ। জগৎ অন্ধকার হয়। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত এদের মুক্তি নেই। যখন সব অন্ধকার হয় তখন নেশা কেটে যায়। তখন তারা রাত জেগে পাখির ডানা ঝাপ্টানি শোনে। সুযোগ পেলেই তত্ত্বকথা বলে। অন্ধরা তত্ত্বকথা বলতে বড় ভালোবাসে।

আজরফ অনুফাকে ছেড়ে ছিল। যা ভাবা গিয়েছিল তাই। অনুফা একটু উড়ে গিয়েই আবার এসে বসল চাটাইয়ের মাথায়। আজরফ ক্লান্ত স্বরে বলল, হুস হুস যা ভাগ।

অনুফা গেল না। তার বসার ভঙ্গি ঋজু ও গর্বিত। তার পালক দুধের মতো সাদা। একটি সতেজ স্বাস্থ্যবান পাখি।

যা ভাগ ভাগ। যা।

কক কক।

ভাগ ব্যাটা ভাগ।

কক কক ককর।

পাখি মারা ছাড়ছি, তুই যা।

কক কক।

অনুফা তার ধবধবে সাদা পালকে ঠোঁট ঘসল। এর মানে কী? এইটিই কি সেই পাখি?

কড়া রোদ। আকাশ ঘোলাটে। অনেকগুলি পাখি চক্রাকারে উড়ছে। যেন সাহস দিচ্ছে অনুফাকে। আছি, আমরা আছি। আজরফের হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। শরীর ঝনঝন করছে। স্নায়ু টানটান হয়ে উঠছে। সময় নেই। আজই সেই বোঝাপড়ার দিন। অতি দ্রুত এখন অনুফার হলুদ পা ঝাপ্টে ধরে ফেলতে হবে। বিদ্যুৎগতিতে নামিয়ে আনতে হবে নিচে। আজরফ ঘাড় উঁচু করে তাকাল। অনুফাও তাকাল। আজরফের চোখে আবার জল আসছে। পাখিটিকে আবার প্রকাণ্ড মনে হচ্ছে। যেন সাদা পালকের অতিকায় একটি অচেনা পাখি। এর জন্ম অদেখা কোনো এক ভুবনে। মাথার উপর উড়তে থাকা বকগুলি দ্রুত নিচে নেমে আসছে। আজরফ হাত বাড়াল। আসছে, ওরা নেমে আসছে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কাঁপিয়ে তারা ডাকল— কক কক।

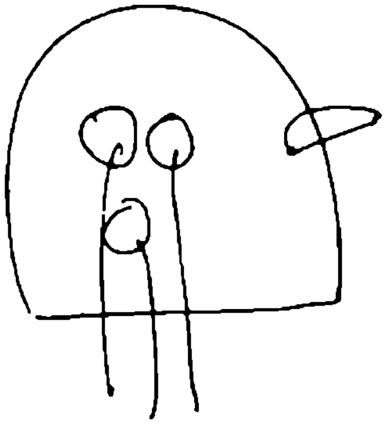

পাখির পালক

হ্যালো জরী ?

হ্যাঁ।

কেমন আছ ?

আপনি কে বলছেন ?

আমি একটু থমকে গেলাম। জরী কি সত্যি সত্যি আমার গলা চিনতে পারে না ? তা কেমন করে হয় ?

হ্যালো, কথা বলছেন না যে ?

আমি। আমি আনিস।

ও, তাই বলেন। আপনার কি ঠাণ্ডা লেগেছে ?

না তো।

গলার স্বর ভারী।

আমি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করলাম। আমার গলার স্বর ঠিকই থাকে, কিন্তু জরীর কাছে কখনো মনে হয় ভারী, কখনো ভাঙা ভাঙা। কোনোদিন চিনতে পারে না।

হ্যালো জরী, তুমি কি আজ বাসায় থাকবে ?

কখন বলুন তো ?

এই ধর বিকেলে।

উঁহু, বিকেলে থাকব না। কেন ?

একটু দরকার ছিল। সন্ধ্যাবেলা থাকবে ?

না, সন্ধ্যাবেলা জুনু খালাদের বাসায় যাব।

কখন ফিরবে?

তা কী করে বলব! জুনুখালা কি সহজে ছাড়বে? রাতে হয়তো ফিরবই না।

জরী খিল খিল করে হাসল। যেন রাতে না-ফেরাটা খুব একটা হাসি তামাশার ব্যাপার।

হ্যালো আনিস ভাই, একটু ধরুন তো, কে যেন আমাকে ডাকছে। আসছি এক্ষুনি।

আমি টেলিফোন কানে লাগিয়ে বসে রইলাম। গ্রীন ফার্মেসির ছেলেটা আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। তার মুখে বিরক্তির রেখা গাঢ় হতে শুরু করেছে। সে গম্ভীর স্বরে বলল, কতক্ষণ ফোন ধরে বসে থাকবেন? ইম্পর্টেন্ট কল টল আসতে পারে। লাইন আটকে রাখলে চলে নাকি?

এই যে ভাই একটু।

একটু একটু করে তো একঘণ্টা নিয়ে নিলেন।

আমি না শোনার ভান করে একটু ঘুরে দাঁড়ালাম। লাইনের ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম কিছুক্ষণ পোঁ পোঁ শব্দ হচ্ছিল। এখন তাও নেই। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা। জরী নিশ্চয়ই ভুলে বসে আছে। জরীর মা হয়তো রিসিভার উঠিয়ে রেখেছেন। ঘণ্টাখানেক পর আবার করলে কেমন হয়।

কিরে ভাই, আপনার হয়েছে? না কানে নিয়ে আরো খানিকক্ষণ বসে থাকবেন?

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। একটা ময়লা এক টাকার নোটও বাড়িয়ে দিলাম। পয়সা দিয়ে ফোন করি, তবু এমন যন্ত্রণা। ইচ্ছা করছিল একটা চড় দিয়ে ছেলেটার মুখে আঙুলের দাগ বসিয়ে দেই। হারামজাদা ছোটলোক! কিন্তু সেরকম কিছুই করি না। সারা মুখে একটা তেলতেলে ভাব এনে নরম স্বরে বলি, বিজনেস কেমন?

সে জবাব দেয় না।

নেন একটা সিগারেট নেন।

সে নিতান্ত অবহেলায় সিগারেট ধরায়। আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। রহমানকে বলে, এই শালাকে একটা ধোলাই দিলে দিলে কেমন হয়? শালা হারামি।

আজ আমার কিছু করবার নেই। কোনোদিনই অবশ্যি থাকে না। তবে আজ আমি বিশেষ রকম ফ্রি। বাজার করতে যেতে হয় নি। বাবা বাজারে গিয়েছেন। তিনি সপ্তাহে দু'দিন বাজারে যান। আজ হচ্ছে সেই দু'দিনের একদিন। আজ তিনি

দুপুর পর্যন্ত মাছের বাজারে ঘুরবেন। অসংখ্য মাছ টিপে টিপে দেখবেন এবং শেষ পর্যন্ত কিছু পচা মাছ কিনে অন্ধকার মুখে বাড়ি ফিরবেন। লেবুপাতা দিয়ে সেই মাছ রান্না হবে। বাড়িওয়ালার একটি লেবুগাছ আছে। তার পাতাগুলি আমরা পচা মাছ দিয়ে দ্রুত খেয়ে ফেলছি। সেদিন বাড়িওয়ালার মেয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে, এ-কী, গোটা গাছটাই দেখি মুড়িয়ে ফেলেছে ! এখন থেকে কেউ গাছে হাত দিতে পারবে না। এইসব সহ্য হবে না। গাছ তোলা সহজ ঝামেলা ?

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটা দারুণ ক্যাটক্যাট করে। মেয়েটার অনেক বয়স। কিন্তু রোগা এবং বেঁটে বলে বয়সটা চোখে পড়ে না। মেয়েটির দাঁত ভাসা, তবে গায়ের রং দারুণ ফর্সা। ফর্সা রঙের যে-কোনো মেয়ে দেখলেই আমার মা মনে মনে সেই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। এবং মা'র চোখে তার নানারকম গুণাবলী ধরা পড়তে থাকে। এই পুরুষালি মেয়েটি সম্পর্কে মা'র মন্তব্য হচ্ছে— বড় তেজি মেয়ে। আজকালকার যুগে তেজি মেয়েই দরকার। পুতু পুতু মেয়ে দিয়ে কাজ হয় না। আর চুল দেখেছিস ? হাঁটু পর্যন্ত। একবার চুল বাঁধতেই এই মেয়ের আধাসের তেল লাগে।

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনো কথাবার্তা হয় না। সে আমাকে বখাটে ছেলে হিসেবে জানে। চোখে চোখ পড়লেই সে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। আমি গায়ে মাখি না। এই যুগে কোনো কিছু গায়ে মাখতে নেই। এটা হচ্ছে গায়ে না-মাখার যুগ। সফিকের ভাষায়— 'মু মে লাথ মার ফিন ভি হাসেঙ্গি।' সে ইদানিং উর্দুতে বাতচিত করছে। কখন যে পাবলিকের হাতে মার খাবে। দিনকাল খারাপ। পাবলিক আজকাল সহজেই চেতে যায়।

আমি মতিঝিলের দিকে রওনা হলাম। গন্তব্য জলিলের অফিস। সেখানে থেকেই জরীকে আবার একটা ফোন করা যাবে। বাসে গাদাগাদি ভিড়। সবগুলি মানুষের গা থেকে ঘামের গন্ধ আসছে। হানড্রেড হর্স পাওয়ারের গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে। তবু তার মধ্যেই জরীর সঙ্গের কথাবার্তাগুলি রিহার্সেল দিয়ে রাখলাম।

হ্যালো জরী ?

হ্যাঁ, ইস টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন কেন ? আমার যা রাগ লাগছিল।

লাইনটা হঠাৎ করে কেটে গেল।

আমি তখন থেকে ফোনের সামনে বসে আছি।

সে-কী! কোথায় যে যাবার কথা ছিল। যাও নি ?

যাব কীভাবে ? আপনি যদি ফোন করেন।

শোন জরী, হ্যালো।

বলুন, শুনছি।

আমার পাশের লোকটি হঠাৎ করেই তার কোমর ঝাঁকুনি দিল। ফোনের কথাবার্তা থেমে গেল। জরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় আমার মনটা অস্বাভাবিক তরল অবস্থায় থাকে বলে আমি কিছুই বললাম না। তবে আমার পাশের রোগামতো লোকটি ঠান্ডা গলায় বললেন, ভাইজান, আপনার পাছাটা সামলে রাখেন। বেশি নড়াচড়া করছে। পাছা নাড়ানো লোকটি চোখ লাল করে তাকাল। লোকটি বিশাল। সে থমথমে স্বরে বলল, কী কইলেন?

শুনলেন তো কী বললাম। পাছা সামলান।

খবর্দার!

কাকে খবর্দার বলেন? ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব বুঝলেন। এটা পাবলিক বাস।

পাছা দুলানো লোকটি থমকে গেল। রোগা লোকটির সাহসের তারিফ করতে হয়। মুক্তিযোদ্ধা ছিল বোধহয়। আমি একটু সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দিলাম। বোঝাপড়া করতে চাইলে করুক। কিন্তু মোটা লোকটি ভড়কে গেছে। লোকটির দেহটাই বিশাল, সাহস নেই। সে প্রেসক্লাবে অন্য একজনের মা মাড়িয়ে নেমে গেল।

জলিল অফিসেই ছিল। সাধারণত থাকে না। এটা তার নিজের অফিস। নিজের অফিসে না থাকলে কিছু যায় আসে না। জলিল আমাকে দেখেই ভ্রু কুঁচকাল। এটা সে নতুন শিখেছে। পয়সা হবার পর মানুষ যে জিনিসটা প্রথম শিখে তা হচ্ছে ভ্রু কুঁচকানো। তারপর শিখে কাঁধ ঝাকানো। জলিল কাঁধও ঝাঁকাল। এটা বিশেষ ভালো হলো না। ঠিকমতো শিখে উঠতে পারে নি বোধ হয়।

কিরে তুই যে কী মনে করে?

আসলাম।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। চাস কী?

চাই না কিছু।

টাকাপয়সা চাইলে পাবি না। বন্ধুবান্ধবদের ধার দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ঐদিন শফিক এসে দু'শ টাকা নিয়ে গেল। না দিয়ে পারলাম না। খুব ঝুলাঝুলি।

দিয়ে ভালোই করেছিস।

আর ভালো! ঐ পয়সা কি আর ফেরত পাব ? জলে গেছে।

এত পয়সা তোর, যাক না কিছু জলে।

জলিল খুশি হলো। এই প্রথম তার মুখে হাসির একটা আভাস দেখলাম। জলিলকে খুশি করবার সবচে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে ওর টাকাপয়সা নিয়ে কথা বলা।

কি লাল হয়ে যাচ্ছিস ?

দূর, কী যে বলিস! বহু কষ্টে পাঁচ লাখ টাকার একটা কাজ ম্যানেজ করেছি। একটা কালভার্ট। তবে মারজিন থাকবে না। নানান লোকদের খাওয়াতে হবে।

শালা, তুইই উঠে গেলি আমাদের মধ্যে।

উঠে গেল কথাটা ঠিক না। জলিল বরাবর উঠেই ছিল। তাদের দু' পুরুষের ব্যবসা। ইটের ব্যবসা। তিন-চারটা নাকি ব্রিক ফিল্ড আছে। ব্যবসাদারের ছেলেপুলেরাও পড়াশোনা করে। এবং দেখা গেল ভালই করে। এমএ-তে দিব্যি সেকেন্ড ক্লাস ম্যানেজ করে ফেলল। তারপর একদিন শুনলাম বিজনেস শুরু করেছে। মতিঝিলে অফিস। শফিককে নিয়ে দেখতে এলাম। তেমন কিছু না। ময়লা ময়লা আসবাব। সোফার গদি ছেঁড়া। একটা স্টেনো আছে, শাকচুন্নীর মতো দেখতে। কথা বলে নাকে। তবে জলিল জমিয়ে ফেলল। ওদের রক্তের মধ্যে ব্যবসা। ধাই ধাই করে উঠে গেল। শাকচুন্নীর মতো স্টেনোটা পর্যন্ত সুন্দর হয়ে গেল। শফিক একদিন বলেই ফেলল, বেটি দেখতে খারাপ না। লদকা লদকি করব ? প্রথম লদকা লদকি তারপর হাম তোম। তবে স্টেনোটা আমাদের মোটেই পাত্তা দিল না। তার বড় সাহেবের আমরা হচ্ছি বোসম ফ্রেন্ড, তাতে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। শালী!

জলিল বলল, চা টা কিছু খাবি ?

দিতে বল।

নাকি কফি দিতে বলব ? ভালো কফি আছে।

শালা কফি ধরেছিস নাকি ?

ধরতে হয়। নানান ধরনের লোকজন আসে। বাংলাদেশে ব্যবসা করা মুশকিল আছে।

মুশকিল থাকবেই। মাগনা কেউ পয়সা দিবে নাকি ?

জলিল সিগারেট বের করে ধরাল। দামি জিনিস। কিন্তু প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়াল না। ইচ্ছা হলে তুলে নিতে পার এই ভাব। নিজ থেকে দেবে না। ইংগিতও করবে না। এই কায়দাটিও সে নতুন শিখেছে। ইউনিভার্সিটিতে দেদার বিলাতো। তার সঙ্গে আমাদের খাতিরের মূল কারণই ছিল ফ্রি সিগারেট।

কফি চলে এলো। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে ওর প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলাম। জলীল গম্ভীর হয়ে বলল, করছিস কী এখন?

কিছু করছি না।

না করলে হবে নাকি? কিছু একটাতে লেগে পড়।

দেখি।

দেখতে দেখতে তো চুল পাকিয়ে ফেলছিস। পাবলিক ওয়ার্কসের ঐ চাকরিটা কি হলো? হয় নাই?

এটাতে আমার ইন্টারেস্ট নাই। বোগাস জিনিস।

বোগাস কেন?

আমি জবাব না দিয়ে বললাম, একটা টেলিফোন করব।

জলিল সঙ্গে সঙ্গে মুখ অন্ধকার করে ফেলল।

আমার এইখানে যেই আসে তারই দেখি টেলিফোন করা লাগে। ঐ দিন শফিক এসে চিটাগাংএ কল করল। এটা কি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নাকি?

পয়সা দেব শালা। মাগনা করবা না।

পয়সার গাছ হয়েছে তো তোর। কোথায় করবি? সেই তোর জরিনা না কী যেন, তার কাছেই নাকি?

আমি জবাব দিলাম না।

কেন খামাখা ঝুলাঝুলি করছিস। ঐ মেয়ে তোর সাথে ভিড়বে নাকি? শুধু খেলাবে।

বুঝলি কী করে খেলাবে?

ঐসব বোঝা যায়।

জলিল হাই তুলল। শালা হামবাগ দু'টা পয়সা হাতে আসতেই সবকিছু বুঝে ফেলছে।

ঐসব চিন্তা বাদ দে। চোখ বুঁজে কোনো একটা কিছুতে লেগে পড়। বিজনেস করতে চাস সুযোগ সন্ধান দিতে পারি।

চুপ থাক। বিজসেন আমি করব না। ছোটলোকের কাজ। ঐসব পোষায় না।

জলিল মুখ কালো করে ফেলল। ব্যাটাকে আরেকটু ঘায়েল করবার জন্যে আমি সরু গলায় বললাম, বিজনেসওয়ালাকে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দেয় না। মেয়ের বাপ মেয়ে দেয় না। বাংলাদেশে বিজনেসম্যানরা হচ্ছে শিডিউল কাস্ট। কই দেখি টেলিফোনটা।

জলিল ফোন এগিয়ে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালো। তার মুখ কালো। আমি তার আঁতে ঘা দিয়েছি। নীলুফার নামের একটি মেয়ের প্রতি তার কিছু রস সঞ্চার হয়েছিল। মেয়ের বাবা রাজি হন নি। সোজা বলে দিয়েছেন— বিজনেসম্যানের কাছে মেয়ে দিব না। মাসখানেক জলিল খুব গম্ভীর ছিল। অফিসে গেলে কথা বলত না। চা খাওয়াতে বললে বলত, চা হবে না, চিনি নেই। খসরুকে একদিন তো চূড়ান্ত অপমান করল। খসরু ঘরে ফিরবার জন্যে দশটা টাকা চেয়েছিল রিকশা ভাড়া। জলীল বলেছে, হেঁটে হেঁটে বাড়ি যা। ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চাপতে লজ্জা লাগে না ?

ভিক্ষা কোথায় ? ফেরত দেব।

বড় বড় বাত দিয়ে লাভ নাই। ফেরত দেবার মুরোদ তোর নেই।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। ভিক্ষাই করবি সারা জীবন। ভিক্ষা করবি আর ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চড়বি। তোদের আমার চেনা আছে।

মুখ সামলে কথা বল শালা। একটা ফর্টি নাইন বসিয়ে দেব মুখে।

সেটা পারলেও তো কাজ হতো। সেটাও পারবি না। চোটপাট যা করবার মুখেই করবি। তোদের আমি চিনি।

হ্যালো জরী।

হ্যাঁ। কে কথা বলছেন ?

আমি। আমি আনিস।

বুঝতে পারছি। কিছু বলবেন ?

তুমি আমাকে টেলিফোন ধরিয়ে রেখে কোথায় গেলে, তারপর আর এলে না।

ওমা কখন!

আমি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। সত্যি কি তার মনে নেই ? না ইচ্ছা করে ভান করছে। জরী ভান করার মেয়ে নয়।

হ্যালো জরী।

বলুন।

তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।

কথা থাকলে বলুন। শুনছি।

টেলিফোনে বলা যাবে না।

এমন কী কথা যা টেলিফোনে বলা যাবে না ?

আমি সামনাসামনি বলতে চাই। কবে তুমি ফ্রি থাকবে বলো তো।

আমি ফ্রি নেই। বাড়িভর্তি মেহমান, নানান ঝামেলা। এদিকে সামনের সপ্তাহে নেপাল যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছ ?

নেপাল। দুলাভাই নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম কথা ছিল কক্সবাজার যাব। পরে হিসাব করে দেখলাম কক্সবাজার যেতে যে খরচ নেপাল যেতে একই খরচ। শেষে নেপাল যাওয়া ঠিক হলো।

কতদিন থাকবে ?

বেশিদিন থাকা যাবে না। এক সপ্তাহ। ওখানে থাকার খরচ খুব বেশি। টুরিস্ট স্পট তো। আমেরিকানরা এসে এসে সব জিনিসের দাম বাড়িয়ে ফেলেছে। আচ্ছা রাখি ?

হ্যালো জরী।

বলুন। একটু তাড়াতাড়ি বলুন, মা আমাকে ডাকছে। হ্যালো, বলুন কী বলবেন। হ্যালো।

আমি কিছু বললাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে বলার কিছু পাওয়া গেল না। জলিল বলল, কী, কথা শেষ ?

হুঁ।

কী করবি এখন ? বাড়ি যাবি ?

হুঁ।

আমি উঠে পড়লাম। জলিল বলল, চল নিউমার্কেট পর্যন্ত লিফট দেই। সোভাহান, গাড়ি বের করতে বলো তো।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

গাড়ি কিনেছিস নাকি ?

এখনো পুরোপুরি কিনি নি। ট্রায়াল দিয়ে দেখছি। এক সপ্তাহর জন্যে ট্রায়াল দিতে এনেছি। তবে বোধহয় কিনব।

দাম কত ?

এক লাখ চায়। পুরনো গাড়ি, কিছু কমাবে। আমি সত্তরে আছি। এর বেশি হলে নো। খুব টাইট অবস্থা আমার।

জলিল আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। গাড়িতে উঠে নিজ থেকেই সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

দেখিস ভাই গাড়িতে ছাই ফেলিস না। একটু টিপটপ কন্ডিশনে রাখতে চাই। দেখ হাতলের কাছে ছাইদান আছে।

আমি খুব সাবধানে ছাইদানে ছাই ফেলতে লাগলাম। জলিল গম্ভীর গলায় বলল, সোভাহান সরোদটা দাও তো।

দারুণ আরামের গাড়ি। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। জলিল বলল, কালারটা কেমন দেখছিস ? সোবার না ?

হুঁ।

আরেকটা পেয়েছিলাম, লাল। লাল আমার পছন্দ না। এত দাম দিয়ে একটা জিনিস কিনব, কী বলিস ?

তা তো ঠিকই।

এই লাইনে গাড়িটা হচ্ছে একটা নেসিসিটি। নানান ধরনের পার্টির কাছে যেতে হয়। সব জায়গায় রিকশা চেপে গেলে মান থাকে না।

তা তো ঠিকই। তুই এখন মানী লোক।

ঠাট্টা করছিস নাকি ?

না, ঠাট্টা করব কেন !

সরোদ কেমন লাগছে ?

ভালোই।

ভালো বললে হয় না। বুঝলি, ক্লাসিক জিনিস।

হুঁ।

নে নে আরেকটা সিগারেট নে।

থাক। এইমাত্র তো খেলাম।

তাহলে রেখে দে একটা। ভাত খাওয়ার পর খাস।

জলিল আমাকে যথেষ্ট খাতির করল। বাসার সামনে এনে নামিয়ে দিল।

খেতে বসে দেখি বাবা আজ ভালোই বাজার করেছেন। মাছ পচা নয়। টাটকা সরপুঁটি। মা হাসিমুখে বললেন, বাজারে আজ মাছ সস্তা গেছে।

তাই নাকি ?

হুঁ।

বাবা আজ অফিসে যান নি দেখলাম।

তার শরীরটা ভালো না।

কী হয়েছে ?

বুকে নাকি ব্যথা করছে। শুয়ে আছেন। বয়স হয়েছে তো।

দুপুরের খাওয়াটা ভালোই হলো। তবে বেচারা বাবা খেতে পারলেন না। বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে রইলেন।

বিকালে তোর বাবাকে মগবাজারে নিয়ে যাস।

ঠিক আছে।

মগবাজারে আমার এক মামা থাকেন। ডাক্তার বিনা পয়সায় আমাদের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা ভালোই করেন। রোগ সারে।

পান খাবি ?

দাও একটা।

মা পান এনে দিলেন। তাকে হাসিখুশিই মনে হলো। তিনি বিছানায় পা উঠিয়ে বসলেন।

বাড়িওয়ালীর বউ এসেছিল আজকে, বুঝলি।

কেন ?

নানান গল্পগুজব করল। শেষে বলল, আমার মেয়েটার জন্যে একটা ছেলে দেখেন না আপা। ভালো পরিবারের শিক্ষিত ছেলে হলেই হবে। চাকরিবাকরি বা ব্যবসা বাণিজ্যের একটা কিছু ব্যবস্থা আমরাই করব।... নজরটা তোর দিকে, বুঝলি তো ?

তুমি কী বললে ?

আমি কিছু বলি নাই। আগ বাড়িয়ে কিছু বললে ভাববে আমাদের গরজ। কী দরকার!

আমি চুপ করে রইলাম। মা বললেন, কথায় কথায় আবার শুনিয়ে দিল মেয়ের নামে পঁচিশ হাজার টাকা জমা আছে। তা আছে ঠিকই। টাকার কুমীর।

মা তৃপ্তির হাসি হাসলেন। আমি বারান্দায় গিয়ে জলিলের সিগারেটটা ধরালাম। খাবার পর একটা দামি সিগারেট বেশ লাগে। মনের মধ্যে অনেক উচ্চশ্রেণীর ভাব আসে।

বাড়িওয়ালার মেয়েটা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দূর থেকে তার ফর্সা হাত দেখা যাচ্ছে। চুলগুলি ছাড়া। মা ঠিকই বলেছেন। লম্বা চুল মেয়েটির। জরীর চুলও কি লম্বা ? আমি কখনো লক্ষ করি নি। জরীর মতো মেয়েদের কখনো খুঁটিয়ে দেখা হয় না। এদের সঙ্গে দেখা হয় স্বপ্নে। স্বপ্ন সবসময়ই অস্পষ্ট।

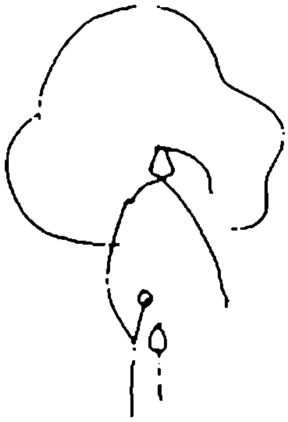

অসুখ

নয়াপল্টনের এক গলিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার রিফ্লেক্স অ্যাকশান খুব ভালো। চট করে একটা দোকানের আড়ালে চলে গেলাম। কিন্তু তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে রঞ্জু না? তিনি এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, কেমন আছেন স্যার?

অতিরিক্ত উত্তেজনায় স্যারের হাঁপানির টান এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে শ্বাস টানতে লাগলেন। দম ফিরে পাওয়া মাত্র প্রথম যে কথাটি বললেন, চল আমার সঙ্গে।

এখন তো স্যার যেতে পারব না। জরুরি কাজ আছে মতিঝিলে। একজন বসে থাকবে।

স্যার আরো জোরে আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আমি হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাব।

স্যার, আমি বরং কাল সকালে একবার আসব। বাসায় থাকবেন তো? সকাল দশটার মধ্যে চলে আসব।

আমি তোমাকে অনেকদিন থেকে খুঁজছি। তুমি যে ঠিকানা দিয়েছিলে সেই ঠিকানায় কয়েকবার গেছি। সেইখানে তো কেউ থাকে না।

আমি জবাব দিলাম না। স্যার বললেন, খোকনের মার অবস্থা খুব খারাপ। তোমাকে খুঁজছি এইজন্যেই।

অসুখ বেড়েছে নাকি?

বাড়া কমা আর কী! বেশিদিন বাঁচবে না। মরাই এখন ভালো।

আমি কিছু বললাম না। স্যার মৃদুস্বরে বললেন, এখন খুব বিরক্ত করে। চেঁচামেচি করে। আর ভাল্লাগে না। তোমাকে অনেক খুঁজেছি। কেউ ঠিকানা বলতে পারে না।

তারপর আর না যাওয়া ভালো দেখায় না। আমি বিরক্ত মুখে হাঁটতে শুরু করলাম। মতিঝিলে ফজলু আমার জন্য সত্যি সত্যি অপেক্ষা করবে। তার আমাকে নিয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়ার কথা। সেই ইঞ্জিনিয়ার নাকি ইচ্ছা করলেই দু'তিনটা চাকরি দিয়ে ফেলতে পারেন। এইসব গালগল্প আজকাল আমি আর বিশ্বাস করি না। তবু যে যা বলে করি। এখন যদি কেউ আমাকে বলে অমুক লোকের বাড়ির সামনে গিয়ে দশবার ডিগবাজি খেলে আমার একটি চাকরি হবে, আমি সম্ভবত তাও করব। ফজলু করবে তারচেয়েও বেশি। সে হয়তো বিশটা ডিগবাজি খাবে।

আমরা হাঁটছি নিঃশব্দে। রাস্তায় হাঁটলেই আমার সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করে। এখন সেটা সম্ভব নয়। কারণ, আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে যিনি হাঁটছেন তিনি স্কুলে আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। এবং তাঁর বড় ছেলেটির সঙ্গে এককালে আমার দারুণ বন্ধুত্ব ছিল।

স্যার, বাসার অন্য সবাই ভালো?

স্যার জবাব দিলেন না। সম্ভবত এখন আর তিনি কানে তেমন ভালো শুনেন না। স্কুলে থাকতেও কম শুনতেন। একই কথা তিনবার চারবার বলতে হতো। আমি আরেকবার বললাম, বাসার সবাই ভালো তো স্যার?

ভালো।

নীলুর বিয়ে হয়েছে?

কী বললে?

নীলুর বিয়ে হয়েছে নাকি?

হয়েছে।

ছেলে কী করে?

ব্যবসা করে।

আমার অল্প একটু মন খারাপ হলো। নীলু মেয়েটি অসম্ভব রূপসী। এককালে নীলুর জন্যে আমার বেশ দুর্বলতা ছিল। বেনামিতে কয়েকটি চিঠিও লিখেছিলাম। সেইসব আমার লেখা টের পেয়ে নীলু কেঁদেকেটে অস্থির।

আমি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। স্যার বললেন, রিকশা নিব নাকি? হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

না না, কষ্ট কিসের! চাচির চিকিৎসা করাচ্ছেন ?

মৃত্যুই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা।

বিলু কেমন আছে ?

ভালো। ওরও বিয়ে হয়েছে, জামাই সিলেটের চা বাগানে কাজ করে।

খুব অল্পবয়সে বিয়ে দিলেন মনে হয়।

অল্প কোথায় ? তাছাড়া ঝামেলা কমল। ঝামেলা এখন আর ভালো লাগে না।

স্যার আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রায় দু'বৎসর পর এলাম এবাড়িতে। কিছুই বদলায় নি। কিছু কিছু বাড়ি আছে যেগুলি সবসময় আগের মতো থাকে। পর্দার রঙ পর্যন্ত পাল্টায় না। কিংবা হয়তো সবসময় একই রঙের পর্দা কেনা হয়।

আমাকে অবাক করে দিয়ে নীলু এসে ঢুকল। মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে হয়তো। বেশ সেজেগুজে আছে। বিয়ে হবার জন্যেই হোক কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক তাকে দেখাচ্ছে আরো সুন্দর। নীলু এসেই ঝগড়ার ভঙ্গিতে বলল, আপনি বাবাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছিলেন কেন ?

ভুল না। আমি এক অ্যাড্রেসে বেশিদিন থাকি না।

রঞ্জু ভাই, আপনি একটা মিথ্যা কথা বললেন। যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সে ঠিকানায় রঞ্জু নামের কেউ কোনোদিন ছিল না।

আমি চুপ করে রইলাম। নীলু বলল, মা'র জন্যে তো অন্তত এক আধবার আপনার আসা উচিত। উচিত না ?

সময় পাই না।

সময় পান না কেন ?

নানান ধান্ধায় থাকি।

আজ কিন্তু সন্ধ্যার আগে যেতে পারবেন না। সন্ধ্যাবেলা আমার বর আসবে, সে আপনার সঙ্গে যাবে। দেখে আসবে আপনি কোথায় থাকেন।

নীলু এমনভাবে বর কথাটি বলল যে, তাকে আরো সুখী সুখী মনে হলো। বোধহয় বেশ ভালো বিয়ে হয়েছে। গলায় ভারী একটা হার। হাতে মোটা মোটা বালা। ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি, বেনামি চিঠিগুলির কথা মনে আছে ?

জিজ্ঞেস করবার আগেই স্যার এসে ভেতরে নিয়ে গেলেন। মৃদুস্বরে বললেন, কাপড়চোপড় এখন আর ঠিক থাকে না। ঠিকঠাক করতে সময় লাগে।

ঘরটি অন্ধকার। কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না। স্যার বললেন, আলো সহ্য করতে পারে না, এইজন্যে এই ব্যবস্থা।

আমি বললাম, চাচি, ভালো আছেন ?

কোনো উত্তর এলো না। নীলু বলল, মা চিনতে পারছ ? ভাইয়ার বন্ধু। রঞ্জু ভাই।

বিছানার উপর কিছু একটা যেন নড়ল। পরিষ্কার গলায় চাচি বললেন, জানালাটা খুলে দে নীলু।

ঘরে আলো হয়ে উঠতেই অপ্রকৃতস্থ মহিলাটিকে আবার দেখলাম। কী ঝকঝকে চোখ ! বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। মাথা ঝিম ঝিম করে উঠে। আমি দ্বিতীয়বার বললাম, চাচি, আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি খোকনের বন্ধু।

চাচি কোনো জবাব দিলেন না। স্যার বললেন, ও আগাগোড়াই খোকনের সঙ্গে ছিল। খোকন কীভাবে মারা গেছে সেটা ও খুব ভালো জানে। রঞ্জু, তুমি বলো তো খোকন কীভাবে মারা গেল।

আমি চুপ করে রইলাম। নীলু বলল, রঞ্জু ভাই, আপনি বলেন। মা কথা সব বুঝতে পারেন। আর আপনাকে মা চিনতে পেরেছেন।

যে গল্প আরো কয়েকবার এই অপ্রকৃতস্থ মহিলাকে শুনিয়েছি সেই গল্প আবার শুরু করলাম। চাচি তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

মেথিকান্দা অপারেশনে খোকনের তলপেটে গুলি লাগে। ওকে নিয়ে আমরা পালিয়ে আসি। খোকন মারা যায় নৌকায়। নৌকায় করে আমরা পালাচ্ছিলাম।

চাচি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, এটা কি সত্যি কথা ?

জি সত্যি।

চাচির গলা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে গেল, এটা কি সত্যি ?

জি চাচি সত্যি। শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলব কেন ?

চাচি এইবার কেঁদে উঠলেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, তবে যে ওরা বলে খোকনকে মিলিটারিরা ধরে ফেলেছিল, তারপর মাঠের মধ্যে নিয়ে জবাই করেছে।

চাচি, এটা মিথ্যা কথা।

কেন আমার ছেলেকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে ?

যুদ্ধের সময় এরকম মিথ্যা গুজব রটে চাচি। তাছাড়া ওরা মানুষ কীভাবে জবাই করবে ? ওরা নিজেরাও তো মানুষ।

বলতে বলতে আমি ফ্যাকাশে ভাবে হাসতে চেষ্টা করলাম। চাচি আর কিছু বললেন না। তাঁর উত্তেজনা কমে আসছে। এখন বেশ কিছুদিন শান্ত থাকবেন। কয়েক রাত তাঁর সুনিদ্রা হবে। তারপর আবার অস্থির হয়ে পড়বেন। স্যার খুঁজতে থাকবেন আমাকে।

মিথ্যা কথা বলতে আমার কখনো খারাপ লাগে না। একটি মাকে প্রবোধ দেবার জন্যে আমি এক লক্ষ মিথ্যা অনায়াসে বলতে পারি। কিন্তু তবুও কখনো এ বাড়িতে আসতে চাই না। অপ্রকৃতস্থ এই মহিলাটির সামনে এসে বসলেই আমি নিজেও কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতস্থ হয়ে পড়ি। সীমাহীন ক্রোধ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে কোনো একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ করি। যে অপরাধের কথা এর আগে কেউ কখনো শুনে নি। কিন্তু আমি তা করতে চাই না।

আমি অন্য দশজন মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। একটি ছোট্ট ঘর। একজন মমতাময়ী নারী। একজন মানুষ খুব বেশি কিছু তো কখনো চায় না।

নীলু আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে খুব কাঁদল। নীলুর স্বামী এলো আমার পিছু পিছু। আমি কোথায় থাকি তা জেনে আসবে। লোকটি ভালোমানুষ ধরনের। রাস্তায় নেমেই আমি তাকে বললাম, নীলুর সঙ্গে যে আমার প্রেম ছিল সেটা আপনি জানেন নাকি ভাই? ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। আমি গম্ভীর গলায় বলাম, দারুণ লদকা-লদকি ছিল।

আমি অপ্রকৃতস্থ হতে শুরু করেছি।

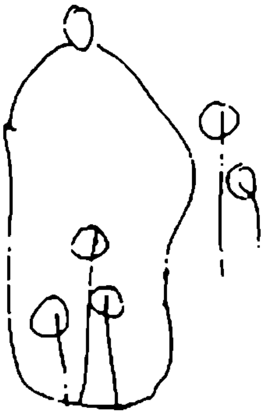

কবি

টাউন প্রেসের মালিক সিরাজুল ইসলাম রাগী রাগী মুখ করে বসেছিলেন। তাঁর রাগের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রুফ রিডার জোবেদ আলী এখনো এসে পৌঁছায় নি। মেশিনম্যান কাজ ছাড়া বসে আছে। তাছাড়া আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়বৃষ্টি হলে সিরাজুল ইসলাম সাহেবকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আজ তার খুব শখ ছিল বিন্তির ওখানে রাত কাটাবেন। তিনি মাসে একবার বিন্তির ওখানে কিছুটা সময় থাকেন। এই মেয়েটি ভালো। বাজে ঝামেলা করে না। এই বয়সে বাজে ঝামেলা তার সহ্য হয় না।

রাত আটটার দিকে সত্যি সত্যি চেপে বৃষ্টি এলো। তার কিছুক্ষণ পর ভিজতে ভিজতে জোবেদ আলী এসে উপস্থিত।

একটু দেরি হয়ে গেল ইসলাম সাহেব। মেয়েটার জ্বর।

সিরাজুল ইসলাম উত্তর দিলেন না। তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন।

ডাক্তার গাদাখানিক ওষুধ দিয়েছে।

তাই নাকি ?

জি।

অসুখটা কী ?

জোবেদ আলী দীর্ঘ সময় নিয়ে অসুখ সম্পর্কে বলতে লাগল। সিরাজুল ইসলাম সাহেবের শোনার আগ্রহ ছিল না। তবু তিনি আগ্রহের একটা ভাব চোখেমুখে ফুটিয়ে রাখলেন।

আজকে একটু তাড়াতাড়ি বাসায় যাব স্যার।

আরে সর্বনাশ, কী বলেন! কাল সকালে ডেলিভারি দিতে হবে। পার্টি দুইবার তাগাদা দিয়ে গেছে। চা খান, চা খেয়ে বসে যান।

জোবেদ আলী বসে গেল। লোকটি প্রুফ দেখার কাজে ওস্তাদ বিশেষ। নটার আগেই এক ফর্মার মতো দেখা হয়ে গেল।

জোবেদ আলী!

জি স্যার।

কী মনে হয়, বৃষ্টি ধরবে ?

বলা তো মুশকিল।

মুশকিল হবে কেন ? বৃষ্টি বাদলা নিয়েই তো আপনাদের কারবার— কবি মানুষ।

জোবেদ আলীর মুখে অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা দেখা গেল।

আপনারা আছেন সুখে। বৃষ্টির মতো একটা বাজে ঝামেলা নিয়েও লিখে ফেলেন মহাকাব্য।

জোবেদ আলীর মুখের হাসি স্পষ্ট হলো। সিরাজুল ইসলাম লোকটিকে সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করে। কিন্তু এই একটি লোকই তাকে কবি বলে খোঁচা দেয়। খোঁচাটিও বড় মধুর মনে হয় তার কাছে।

স্যার, একটু সকাল সকাল যাওয়া দরকার। মেয়েটা স্যার ...

যাবেন যাবেন। কতক্ষণ আর লাগবে ? শেষ করে ফেলেন। বানানগুলিও দেখবেন।

জোবেদ আলী গভীর মনোযোগে বানান দেখে। সিরাজুল ইসলাম দেখেন বৃষ্টি। মাসের বিশেষ বিশেষ ফূর্তির দিনগুলিতে বৃষ্টি বাদলা হয় কেন এই রহস্যের তিনি মীমাংসা করতে পারেন না। তার কাছে জগতের অমীমাংসিত রহস্যের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

বিন্তি মেয়েটির গায়ের রঙ কালো। কালো মেয়েগুলি সাধারণত মায়াবতী হয়। একটি কালো মায়াবতী স্ত্রীর জন্যে তার একধরনের ক্ষুধা বোধ হয়। কিন্তু তার স্ত্রীর গায়ের রঙ ফর্সা। দারুণ-ফর্সা। শুধু গায়ের রঙের জন্যে তার সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যায়। মেয়েটির উঁচু দাঁত তখন চোখে পড়ে নি। কিংবা দাঁত হয়তো সেসময় উঁচু ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দাঁত আরো উঁচু হচ্ছে। এবং গায়ের রঙ হচ্ছে আরো সাদা। এখন তাকে শ্বেতীরোগীর মতো লাগে।

স্যার বাকিটা কাল সকালে দেখে দিব।

আরে পাগল নাকি ? সকালেই পার্টি আসবে। শেষ করে ফেলেন। কতক্ষণ আর লাগবে ? চা খাবেন ?

জি-না।

খান খান। ঐ চা দে তো। তারপর কবি সাহেব, নতুন কবিতা কী লিখলেন ?

একটা ছোট লিরিকের মতো লেখলাম গত রাত্রে।

বলেন কী!

শুনবেন স্যার ?

থাক থাক কাজ করেন। কাজের সময় কাব্যচর্চা ঠিক না।

জোবেদ আলী প্রুফের উপর চোখ রেখে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'দেশের মাটি'তে ছাপা হবে।

তাই নাকি ?

জি। সম্পাদক সাহেব খুব প্রশংসা করলেন।

ভালো ভালো। এইবার বই বের করে ফেলেন।

বলতে বলতে সিরাজুল ইসলামের মনে হলো বৃষ্টি ধরে আসছে। সিরাজুল ইসলাম রক্তের মধ্যে একধরনের চঞ্চলতা অনুভব করলেন। বিন্তি মেয়েটি কথা বলে টেনে টেনে। যশোর টশোরের দিকে বাড়ি নিশ্চয়ই। তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেন নি। এই জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে বাড়তি খাতির রাখা ঠিক না। দূরে দূরে থাকতে হয়।

জোবেদ আলী কাজ শেষ করে উঠে পড়ল। এবং মুখে কালো করে ইতস্তত করতে লাগল। এই ভঙ্গিটি সিরাজুল ইসলামের চেনা। কাজেই তিনি ভারী গলায় বললেন, পার্টির কাছ থেকে আদায়পত্র কিছু হয় নাই। বিজনেস তুলে দিতে হবে বুঝলেন ?

দশটা টাকা হবে ? কলা নিয়ে যেতে বলেছিল।

সিরাজুল ইসলাম অপ্রসন্ন মুখে একটা নোট বের করে দিলেন। মাসের মাঝামাঝি টাকা দিতে তার ভালো লাগে না।

যাই স্যার।

সিরাজুল ইসলাম জবাব দিলেন না। তার মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল। কারণ বড় বড় ফোঁটায় আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

জোবেদ আলী বাসায় ফিরে দেখেন মেয়ের জ্বর কমে গিয়েছে। মেয়ে অপেক্ষা করছে বাবার জন্যে। কলা এলে দুধ কলা দিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু রাত বেড়ে গিয়েছিল। কলা পাওয়া যায় নি। জোবেদ আলীর বেশ খারাপ লাগল।

কাল সকালে কলা নিয়ে আসব।

আচ্ছা।

সবরি কলা, না সাগর কলা?

যেটা তোমার ইচ্ছা।

ঠিক আছে।

জোবেদ আলী খেয়ে দেয়ে তার খাতা নিয়ে বসল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই একটা সুবিধা হয়েছে, গভীর রাতে বইখাতা নিয়ে বসলেও কেউ কিছু বলে না।

ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এরকম ঝড়বৃষ্টির রাত ঘুমিযে কাটানোর কোনো মানে হয় না।

জোবেদ আলীর মেয়েটি ঘুমাল না। তার জ্বর আসছিল। সে কাঁথা গায়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে বাবাকে দেখতে লাগল। একবার সে ফিস ফিস করে ডাকল, বাবা। জোবেদ আলী শুনতে পেল না। তার মনে অদ্ভুত সুন্দর একটা লাইন এসেছে, 'কী সুন্দর বৃষ্টি আজ রাতে।' অন্য লাইনগুলি আর মনে আসছে না। এই একটি লাইনই ঘুরে ফিরে আসছে। গভীর আবেগে তার চোখ ভিজে উঠল।

মেয়েটির জ্বর বাড়ছে। সে আবার ডাকল, বাবা। বাইরে ঝড়বৃষ্টির শব্দে সে ডাক চাপা পড়ে গেল। মেয়েটি জ্বরতপ্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বাবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে কিছুই বুঝতে পারল না। শিশুরা অনেক কিছুই বুঝতে পারে, আবার অনেক কিছুই বুঝতে পারে না।

—